

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) ১ম পর্ব: আল-ফিকহ বিভাগ
ফিকহ ৪র্থ পত্র: আল কাওয়াইদুল ফিকহিয়াহ (পত্র কোড-৬৩১১০৪)

مجموعة (ب) أجب عن أربعة فقط

ক-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

[যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান ৫×৪=২০]

القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

১. اشرح مدلول قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" وما هو مستندها
["আল ইজতিহাদু লা ইউনকাদু বিল ইজতিহাদ"
(ইজতিহাদ দ্বারা ইজতিহাদ বাতিল হয় না) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং
হানাফী ফিকহে এর মূলভিত্তি কী?]

২. اذكر أربعة من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، ووضح
["আল ইজতিহাদু লা ইউনকাদু বিল ইজতিহাদ" এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে চারটি উল্লেখ
কর এবং সেগুলোর উপর কারখীর বিধান কীভাবে প্রযোজ্য হয়, তা ব্যাখ্যা কর।]

৩. ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى يجوز للقاضي أن
ينقض اجتهاد قاض آخر أو اجتهاده السابق?
[এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের
বিষয়টি আলোচনা কর, এবং কখন বিচারকের জন্য অন্য বিচারকের ইজতিহাদ বা
নিজের পূর্বের ইজতিহাদ বাতিল করা বৈধ?]

القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

৪. اشرح مدلول قاعدة : "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، وما هي
["ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু গালাবাল হারাম"
(যখন হালাল ও হারাম একত্রিত হয়, তখন হারাম প্রবল হয়) কায়দাটির তাৎপর্য
ব্যাখ্যা কর এবং এর শরয়ী প্রজ্ঞার কারণ কী?]

৫. بين شروط تطبيق هذه القاعدة، وهل يشترط التساوي بين جهتي الحل
والحرمة?
[এ কায়দা প্রয়োগের শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, এবং হালাল ও হারামের
উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা কি শর্ত?]

৬. اذكر القواعد الفرعية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: "احتياطاً في الحل والحرمه" ["ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু..."] এ কায়দার অধীনে আসা শাখা কায়দাগুলো উল্লেখ কর। যেমন : "ফিল হালে ওয়াল হুরমাতি" (হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে সতর্কতা)।]

القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب؟

৭. اشرح مدلول قاعدة: "هل يكره الإيثار بالقرب؟" وما هو الرأي المعتمد. "হাল ইউকরাহুল ঈসারু বিল কুরাব?" ["ইবাদতে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ কি না?] কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত কী?]

৮. بين الفرق بين الإيثار في حقوق الله (العبادات وحقوق الأديمين). المعاملات وحكم كل منهما (মুয়ামালাত)-এর ক্ষেত্রে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর এবং উভয়ের বিধান কী?]

৯. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة، مثل: تقديم الغير. "হাল ইউকরাহুল ঈসারু বিল কুরাব?" এ কায়দা সংশ্লিষ্ট ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন প্রথম কাতারে বা সদকার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।]

القاعدة الرابعة : التابع تابع

১০. اشرح مدلول قاعدة: "التابع تابع" وما هي حجيتها في الأحكام. "আত্তাবিউ তাবি" (অনুসরণীয় বিষয়টি আনুষঙ্গিক) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরয়ী বিধানে এর প্রমাণ কী?]

১১. بين كيف تطبق هذه القاعدة في باب البيع والعقود؟ اذكر مثالا على دخول التابع في المتبوع. [বিক্রয় এবং চুক্তির ক্ষেত্রে এই কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা সুস্পষ্ট কর? মূল বস্তুর সাথে আনুষঙ্গিক বস্তু অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি উদাহরণ দাও।]

১২. وضح الفرق بين التابع الذي يعتد به في الحكم والتابع الذي لا يعتد به. [উদ্দেশ্য ও প্রথা অনুসারে, যে আনুষঙ্গিক বিষয়টি বিধানে গ্রহণযোগ্য এবং যা গ্রহণযোগ্য নয়, তার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।]

১৩. অত্র ত্রীতা মন ফরুও ফকহীয়া মতলুওয়া ইহুদা ক্বাদা, মতল: অত্র তাবিও. ১৩
[“আত্তাবিউ তাবি” এ কাযদা সঙল্লিষ্ট ফিকহি শাখা-প্রশাখার
মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন দান বা ওয়াকফের উপর আনুষঙ্গিক বস্তুর প্রভাব।]

القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

১৪. **اشرح مدلول قاعدة : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"**
 [وما هو مستندها الأصلي في الشريعة؟]
 [তাসাররুফুল ইমামি আলার রায়িয়াতি
 মানুতুন বিল মাসলাহা] (জনগণের উপর শাসকের কাজ জনস্বার্থের সাথে শর্তযুক্ত)
 কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূল ভিত্তি কী?]

১৫. **বিন الفرق بين تصرف الإمام (الحاكم) وتصرف الفرد (الشخص ১৫.**
জনস্বার্থের প্রতি বাধ্যবাধকতার দিক [العادي] من حيث الالتزام بالمصلحة
থেকে শাসকের কাজ এবং সাধারণ ব্যক্তির কাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।]

১৬. অذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل: ১৬। "তাসাররুফুল ইমামি আলার রাযিয়্যাতি..."। تحديد الأسعار أو فرض الضرائب। এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন মূল্য নির্ধারণ বা কর আরোপ করা।]

القاعدة السادسة : الحدود تدرأ بالشبهات

১৭. অশ্রুচ মদুল চ়ে: "অলুও তুরূ ঙ শ্বেহত", ওম হু দলিলহা অসূলি ১৭.
[আল হুদু তুদরাউ বিশ শুবহাত] (সন্দেহ দ্বারা শান্তি রহিত
হয়) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং সন্নাহ থেকে এর মূল দলিল কী?

১৮. **বিন** أنواع الشبهة التي تعتبر مانعا من إقامة الحد، وما هي الشبهة
 শান্তি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টিকারী সন্দেহের প্রকারভেদগুলো
 (আশঙ্কহা) की की. এবং কোন সন্দেহ গ্রহণযোগ্য হয় না?

৯৯. অذكر ثلاثا من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: ৯৯. এই "আল হুদুদ তুদরাউ বিশ গুবহাত" شبهة الملك في السرقة أو الزنا কাযদার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন চুরি বা ব্যভিচারে মালিকানার সন্দেহ ॥

القاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا

২০. اشرح مدلول قاعدة : "الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب..."، ২০. আল হুররু লা ইয়াদখুলু তাহতাল ইয়াদি ফালা ইউদমানু বিল গাসবি... (স্বাধীন ব্যক্তি কর্তৃত্বে আসে না, তাই জবরদখলের কারণে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না...) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী?

২১. بين الفرق الجوهرية بين العين المغصوبة (المال) والحر المغصوب. (الشخص) من حيث حكم الضمان في الفقه الحنفي [হানাফী ফিকহে ক্ষতিপূরণের বিধানের দিক থেকে জবরদখলকৃত বস্তু (সম্পদ) এবং জবরদখলকৃত স্বাধীন ব্যক্তি (ব্যক্তি) এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।]

২২. ناقش مسألة الضمان المالي في حال ترتب ضرر مالي على غصب. (كفوات منفعة)، وهل هذا استثناء من القاعدة؟ [স্বাধীন ব্যক্তিকে জবরদখলের ফলে আর্থিক ক্ষতি (যেমন : মুনাফা হারানো) হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আলোচনা কর, এবং এটি কি কায়দাটির ব্যতিক্রম?]

القاعدة الثامنة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً

২৩. اشرح مدلول قاعدة: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد..."، وما هو ২৩. "ইজা ইজতামাআ আমরানি মিন জিনসিন ওয়াহিদ..." (যখন একই প্রকারের দুটি বিষয় একত্রিত হয়...) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি (ইবাদতে নাকি মুয়ামালাতে)?

২৪. بين شروط انطباق هذه القاعدة، خاصة فيما يتعلق بـ "جنس واحد". "وعدم اختلاف المقصود [ইজা ইজতামাআ আমরানি মিন জিনসিন ওয়াহিদ...] প্রয়োগের শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, বিশেষত "একই প্রকার" এবং "উদ্দেশ্যের ভিন্নতা না থাকা" এর ক্ষেত্রে।]

২৫. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة في باب ২৫. (লেনদেনের (যেমন : বিক্রয় ও ইজারা) ক্ষেত্রে এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর।]

২৬. ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى لا يدخل أحد الأمرين. ২৬. কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং প্রকারের মিল থাকা সত্ত্বেও কখন দুটি বিষয়ের একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে না?

القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل

২৭. اشرح مدلول قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله..". وما هي حكمتها. ২৭. "ইমালুল কালামি আওলা মিন ইতমালিহি..." (সম্ভব হলে কথাকে কার্যকর করা অবহেলা করার চেয়ে উত্তম...) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং উক্তি ও আচরণের ফিকহে এর প্রজ্ঞা কী?

২৮. بين شروط إعمال الكلام وما هو حد الإمكان الذي متى تجاوز تعذر. ২৮. [কথা কার্যকর করার শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, এবং সম্ভাবনার সীমা কী, যা অতিক্রম করলে কথা অবহেলিত হয়?]

২৯. وضح كيف تطبق هذه القاعدة في باب الأيمان والطلاق، خاصة عند. ২৯. [শপথ এবং তালাকের ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, বিশেষত যখন শব্দে দ্বিধা বা স্ববিরোধিতা থাকে, তখন তা কীভাবে প্রযোজ্য হয় ব্যাখ্যা কর।]

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان

৩০. اشرح مدلول قاعدة: "الخراج بالضمان"، وما هو دليلها الأصلي من. ৩০. "আল খারাজু বিদ দামান" (ফলন/লাভ ক্ষতির ঝুঁকি বহনকারী ব্যক্তির জন্য) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং সুন্নাহ থেকে এর মূল দলিল কী?

৩১. بين العلاقة بين الخراج (المنفعة/النماء) والضمان (تحمل. ৩১. [ফিকহি মালিকানায় ফলন (মুনাফা/বৃদ্ধি) এবং ঝুঁকি (ক্ষতি বহন/দায়িত্ব)-এর মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর।]

৩২. وضح كيف تطبق هذه القاعدة في باب البيوع الفاسدة والضمانات. ৩২. [ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয় (বাতিল চুক্তি) এবং (কضمان العين المغصوبة)?]

ক্ষতিপূরণের (যেমন : জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ) ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা ব্যাখ্যা কর।]

৩৩. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل: نتائج. [আল খারাজু বিদ দামান" এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন হস্তগত করার আগে ক্রয়কৃত পশুর বাচ্চা।]

القاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب

৩৪. اشرح مدلول قاعدة: "السؤال معاد في الجواب"، وما هي أهميتها في. [আস-সুয়ালু মু'আদুন ফিল জওয়াব" (প্রশ্ন উত্তরে পুনরাবৃত্ত বলে গণ্য) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শপথ ও স্বীকারোক্তির ফিকহে এর গুরুত্ব কী?]

৩৫. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل :. [আস-সুয়ালু মু'আদুন ফিল জওয়াব" এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন ক্রেতার মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।]

৩৬. ناقش مسألة قيود تطبيق هذه القاعدة؛ متى لا يعد السؤال معاداً في. [আস-সুয়ালু মু'আদুন ফিল জওয়াব" এ কায়দা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা কী? কখন প্রশ্ন উত্তরে পুনরাবৃত্ত বলে গণ্য হয় না?]

القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب إلى ساكت قول

৩৭. اشرح مدلول قاعدة: "لا ينسب إلى ساكت قول"، وما هو مستندها. [লা ইউনসাবু ইলা সাকিতিন কাওল" (নীরব ব্যক্তির দিকে কোনো উক্তিকে সম্বন্ধ করা যায় না) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী?]

৩৮. بين الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة، ومتى يعتبر السكوت. [এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমগুলো সুস্পষ্ট কর এবং ফিকহে কখন নীরবতা স্বীকারোক্তি বা সম্মতি হিসেবে বিবেচিত হয়?]

৩৯. ناقش مسألة الفرق بين السكوت والإعراض، وكيف يختلف الحكم. [নীরবতা এবং উদাসীনতা (বিরত থাকা)-এর

মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর এবং উভয়ের উপর আরোপিত ফিকহি বিধান কীভাবে ভিন্ন হয়?]

القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل

৪০. اشرح مدلول قاعدة: "الفرض أفضل من النفل..."، وما هو الأصل الذي 80. (ফরজ নফল অপেক্ষা উত্তম...) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং কোন মূলনীতির উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত?]

৪১. بين الحكمة من تفضيل الفرض على النفل، وكيف يفسر ذلك أهمية 81. [ফরজের উপর নফলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রজ্ঞা কী, এবং আল্লাহ যা ওয়াজিব করেছেন তা মেনে চলার গুরুত্ব এর দ্বারা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়?]

৪২. ناقش أثر هذه القاعدة في تنظيم سلوك المسلم وتوجيهه نحو الالتزام 82. [এ কায়দাটির প্রভাব একজন মুসলিমের আচরণ বিন্যস্ত করা এবং শরয়ী অগ্রাধিকারের প্রতি পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কী, তা আলোচনা কর।]

القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه

৪৩. اشرح مدلول قاعدة: "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه" وما هو مستندها 83. [মা হারুমা আখযুহু হারুমা ই'তাউহু" (যা নেওয়া হারাম, তা দেওয়াও হারাম) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী (গোনাহের কাজে সহযোগিতা না করা)?]

৪৪. بين حدود هذه القاعدة؛ هل تنطبق على الأموال التي يستعمل فيها 84. [এ কায়দাটির সীমা সুস্পষ্ট কর; এটি এমন সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা হারাম কাজে ব্যবহৃত হয়, নাকি এমন সম্পদের ক্ষেত্রে যা নিজেই হারাম?]

৪৫. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: ثمن 85. [মা হারুমা আখযুহু... এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর। যেমন : মদ বিক্রির মূল্য বা গায়িকার পারিশ্রমিক।]

৪৬. ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى يجوز دفع المال. ৪৬. আল কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন নিরুপায় হয়ে বা বৃহত্তর ক্ষতি দূর করার জন্য হারাম মাল দেওয়া বৈধ?]

القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه

৪৭. اشرح مدلول قاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". ৪৭. "মান ইস্তা'জালাশ শাইয়া কবলা'ওয়ানিহি উকিবা বি-হিরমানিহি" (যে ব্যক্তি সময় হওয়ার আগে কোনো বিষয়ে তাড়াহুড়ো করে, সে তা থেকে বঞ্চিত হয়ে শাস্তি পায়) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এর মূল দলিল কী?]

৪৮. وضح كيف تطبق هذه القاعدة في باب الميراث (كقتل الوارث مورثه). ৪৮. উত্তরাধিকার (যেমন : উত্তরাধিকারীর তার ওয়ারিশকে হত্যা করা) এবং দানপত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা ব্যাখ্যা কর।]

৪৯. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: ৪৯. "মান ইস্তা'জালা..." এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া বা হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা।]

৫০. ناقش مسألة الجزاء المترتب على المخالفة؛ هل يعد الحرمان عقوبة. ৫০. লঙ্ঘনের ফলে শাস্তি (আল-জাযা) বিষয়টি আলোচনা কর; এ বঞ্চনা পার্থিব শাস্তি নাকি ফিকহি বিধান?]

القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

৫১. اشرح مدلول قاعدة: "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" وما ৫১. "আল বিলায়াতুল খাসাসাতু হু দলিলাহা অল্‌লি ফি ফুহু al-af'rad wal-jama'at" (বিশেষ কর্তৃত্ব সাধারণ কর্তৃত্বের চেয়ে শক্তিশালী) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং ব্যক্তি ও সমাজের ফিকহে এর মূল দলিল কী?]

৫২. **بين الفرق بين الولاية الخاصة (كولاية الأب) والولاية العامة (كولاية ٥٢. القاضي أو الإمام) من حيث مصدر كل منهما** [বিশেষ কর্তৃত্ব (যেমন : বাবার কর্তৃত্ব) এবং সাধারণ কর্তৃত্বের (যেমন : বিচারক বা শাসকের কর্তৃত্ব) মধ্যে উৎসগত দিক থেকে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।]

৫৩. **ناقش مسألة القيود على الولاية الخاصة؛ متى تنتقل الولاية من ٥٣. الخاصة إلى العامة؟** [বিশেষ কর্তৃত্বের উপর সীমাবদ্ধতা কী কী? কখন কর্তৃত্ব বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে স্থানান্তরিত হয়?]

القاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالظن البين خطؤه

৫৪. **اشرح مدلول قاعدة : "لا عبرة بالظن البين خطؤه" وما هو الهدف من ٥٤. هذه القاعدة في فقه الإثبات؟** ["লা ইবরাতা বিজ জান্নিল বাইয়্যিনি খাতাউহ্" (যে ধারণার ভুল সুস্পষ্ট, তা ধর্তব্য নয়) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং প্রমাণ সংক্রান্ত ফিকহে এই কায়দাটির উদ্দেশ্য কী?]

৫৫. **اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل : ٥٥. اجتهد المفتي الذي تبين خطؤه بالدليل القطعي** [এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন যে মুফতির ইজতিহাদ সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।]

৫৬. **ناقش مسألة الظن الغالب؛ متى يكون الظن حجة ويعمل به في الأحكام؟ ٥٦. [প্রবল ধারণা (জান্ন গালিব)-এর বিষয়টি আলোচনা কর; কখন ধারণা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর দ্বারা বিধান অনুযায়ী কাজ করা হয়?]**

القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

৫৭. **اشرح مدلول قاعدة : "ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله" وما هي ٥٧. حجيتها في فقه الأقوال؟** ["জিকরু বা'দি মা লা ইয়াতাজায্যাউ কাজিকরি কুল্লিহি" (যা অবিভাজ্য, তার অংশ উল্লেখ করা তার পুরোটাই উল্লেখ করার মতো) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং উক্তির ফিকহে এর প্রমাণ কী?]

৫৮. **بين المراد من "ما لا يتجزأ" في هذه القاعدة، وما هو الفرق بينه وبين ٥٨. الشيء الذي يقبل التجزئة؟** [এ কায়দায় 'যা অবিভাজ্য' বলতে কী উদ্দেশ্য এবং বিভাজ্য বস্তু থেকে এর পার্থক্য কী?]

৫৯. ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى لا يعد ذكر البعض. ৫৯. কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন অংশ উল্লেখ করা পুরোটা উল্লেখ করার মতো বলে গণ্য হয় না?

القاعدة التاسعة عشرة :

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر

৬০. اشرح مدلول قاعدة : "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى ৬০. ইজা ইজতামাআল মুবাশির ওয়াল মুতাসাববিবু..." (যখন সরাসরি কার্য সম্পাদনকারী ও পরোক্ষ কারণ একত্রিত হয়, তখন বিধান সরাসরি কার্য সম্পাদনকারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?

৬১. بين الفرق بين الفعل المباشر والفعل المتسبب في فقه الضمانات. ৬১. ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির ফিকহে সরাসরি কাজ (মুবাশির) এবং পরোক্ষ কারণ (মুতাসাববিব)-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।

৬২. وضح شروط إضافة الحكم إلى المتسبب وحده، ومتى يترك المباشر؟ ৬২. [কখন বিধান কেবল পরোক্ষ কারণের দিকে এককভাবে সম্বন্ধ করার শর্তাবলি কী এবং কখন সরাসরি কার্য সম্পাদনকারীকে বাদ দেওয়া হয়?]

৬৩. اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: حفر. ৬৩. "ইজা ইজতামাআল মুবাশির..." এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন রাস্তায় কূপ খনন করা এবং অন্য কারো নিক্ষেপ করা।

القاعدة الأولى : الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

প্রথম কায়দা: ইজতিহাদ দ্বারা ইজতিহাদ বাতিল হয় না।

প্রশ্ন-১: "ইজতিহাদ দ্বারা ইজতিহাদ বাতিল হয় না" কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং হানাফী ফিকহে এর মূলভিত্তি কী?

اشرح مدلول قاعدة "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد" وما هو مستندها الأصلي (في الفقه الحنفي)?

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরিয়তের বিচার ব্যবস্থা ও ফতোয়ার ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের একটি অন্যতম ও প্রসিদ্ধ মূলনীতি হলো ‘আল ইজতিহাদু লা ইউনকাদু বিল ইজতিহাদ’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর ‘আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর’ গ্রন্থে এই কায়দাটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

- **ইজতিহাদ (الاجتهاد):** শরীয়তের দলিল থেকে বিধান বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো।
- **নাকদ (النقض):** বাতিল করা বা ভেঙে ফেলা।
- **মর্মার্থ:** কোনো মুজতাহিদ বা বিচারক যদি ইজতিহাদ করে কোনো রায় প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে তাঁর বা অন্য কোনো মুজতাহিদের ইজতিহাদে ভিন্ন কোনো মত বা রায় আসে, তবে দ্বিতীয় ইজতিহাদের কারণে প্রথম রায়টি বাতিল হবে না। অর্থাৎ, অতীত হয়ে যাওয়া বিধান অতীতের মতোই বহাল থাকবে।

হানাফী ফিকহে এর মূলভিত্তি বা দলিল (المستند الأصلي):

এই কায়দাটির মূল ভিত্তি হলো হযরত ওমর (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক ফয়সালা ও সাহাবায়ে কেরামের ইজমা (ঐকমত্য)।

ঘটনা: হযরত ওমর (রা.) 'মুশাররাকা' মাসআলায় (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত একটি জটিল সমস্যা) প্রথমে এক ধরনের রায় দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর ইজতিহাদ

পরিবর্তন হলে তিনি ভিন্ন রায় দেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "আপনি তো আগে অন্য রায় দিয়েছিলেন।"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন:

"تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذَا عَلَى مَا قَضَيْنَا"

অর্থ: "এটি ছিল তখনকার ফয়সালা অনুযায়ী, আর এটি হলো এখনকার ফয়সালা অনুযায়ী।"

যৌক্তিক প্রমাণ:

দ্বিতীয় ইজতিহাদটি প্রথমটির মতোই 'ধারণাপ্রসূত' (Zanni/ظني)। প্রবল ধারণার দিক থেকে উভয়ই সমান। আর উসুলুল ফিকহ-এর নিয়ম হলো—সমশক্তির দলিল দ্বারা অন্য দলিল বাতিল হয় না। সুতরাং, দ্বিতীয় ইজতিহাদ দ্বারা প্রথমটি বাতিল করা যাবে না।

উপসংহার (خاتمة):

এই কায়দাটি মুসলিম উম্মাহর বিচার ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা রোধ করে এবং আইনি স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-২: "ইজতিহাদ দ্বারা ইজতিহাদ বাতিল হয় না" এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে চারটি উল্লেখ কর এবং সেগুলোর উপর কারখীর বিধান কীভাবে প্রযোজ্য হয়, তা ব্যাখ্যা কর।

اذكر أربعة من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، ووضح كيف (يسري عليها حكم الكرخي)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

'আল ইজতিহাদু লা ইউনকাদু বিল ইজতিহাদ' কায়দাটি ফিকহী মাসআলার এক বিশাল ভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং ইমাম কারখী (রহ.)-এর মতে এর প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক।

ফিকহী শাখা-প্রশাখা বা উদাহরণ (الفروع الفقهية):

এই কায়দার অধীনে অসংখ্য মাসআলা রয়েছে, নিচে চারটি প্রধান উদাহরণ দেওয়া হলো:

১. কিবলা নির্ধারণ (التحري في القبلة):

কোনো ব্যক্তি ইজতিহাদ বা চিন্তা-গবেষণা করে এক দিকে ফিরে নামাজ পড়ল। পরবর্তী ওয়াক্তে তার ইজতিহাদ পরিবর্তন হলো এবং মনে হলো আগের দিকটি ভুল ছিল। এমতাবস্থায় তার আগের নামাজ পুনরায় পড়তে হবে না। কারণ, (الاجتهاد) (لا ينقض بالاجتهاد)।

২. পোশাক ও পাত্রের পবিত্রতা (طهارة الثياب والأواني):

কারো কাছে একাধিক পানির পাত্র আছে এবং সে ইজতিহাদ করে একটিকে পবিত্র মনে করে ওজু করল। পরে তার মনে হলো অন্য পাত্রটি পবিত্র ছিল। এক্ষেত্রে পূর্বের ওজু ও নামাজ বাতিল হবে না।

৩. বিচারকের রায় পরিবর্তন (قضاء القاضي):

কোনো বিচারক ইজতিহাদ করে একটি রায় কার্যকর করলেন। পরবর্তীতে তাঁর মনে হলো রায়টি ভুল ছিল অথবা অন্য কোনো বিচারক ভিন্ন মত পোষণ করলেন। এমতাবস্থায় কার্যকর হয়ে যাওয়া রায়টি বাতিল হবে না।

৪. জাকাত ও সদকা প্রদান (دفع الزكاة):

কেউ দরিদ্র মনে করে একজনকে জাকাত দিল। পরে জানা গেল সে ধনী। এক্ষেত্রে হানাফী মাজহাবের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী জাকাত আদায় হয়ে যাবে এবং তা ফিরিয়ে নেওয়া বা পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন নেই।

ইমাম কারখীর বিধান বা মূলনীতি (حكم الكرخي):

ইমাম কারখী (রহ.) হানাফী ফিকহের অন্যতম স্তম্ভ। এই কায়দার ক্ষেত্রে তাঁর বিধান হলো:

"الاجتهاد ينتقض في المستقبل لا في الماضي"

অর্থ: "ইজতিহাদ ভবিষ্যতের জন্য পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু অতীতের জন্য বাতিল হয় না।"

অর্থাৎ, নতুন ইজতিহাদ অনুযায়ী এখন থেকে আমল করা হবে, কিন্তু আগের আমল বা রায় ভুল বলে গণ্য করা হবে না। এটিই হলো এই কায়দার ওপর কারখীর বিধানের প্রয়োগ।

উপসংহার (خاتمة):

উক্ত উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, এই কায়দাটি ইবাদত থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থা পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে মুসলিমদের জীবনকে সহজ ও সুশৃঙ্খল করেছে।

প্রশ্ন-৩: এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর, এবং কখন বিচারকের জন্য অন্য বিচারকের ইজতিহাদ বা নিজের পূর্বের ইজতিহাদ বাতিল করা বৈধ?

ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى يجوز للقاضي أن ينقض (اجتهاد قاض آخر أو اجتهاده السابق؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সাধারণ নিয়ম হলো—ইজতিহাদ দ্বারা ইজতিহাদ বাতিল হয় না। তবে শরীয়ত যেহেতু ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম (استثناء) ঘটে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই ব্যতিক্রমগুলো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রসমূহ (الاستثناءات):

যখন কোনো ইজতিহাদ বা বিচারকের রায় শরিয়তের অকাট্য দলিলের বিরোধী হয়, তখন তা বাতিল হয়ে যায়। এই ব্যতিক্রমগুলো মূলত ৩টি ক্ষেত্রে ঘটে:

১. কুরআন-সুন্নাহর স্পষ্ট বিরোধী হলে (مخالفة النص):

যদি বিচারকের রায় কুরআন মাজিদ বা সুন্নাহে মুতাওয়াতিরা (ধারাবাহিক হাদিস)-এর সুস্পষ্ট বিধানের বিপরীত হয়, তবে সেই রায় বা ইজতিহাদ বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, নস (Text) হলো অকাট্য (Qati), আর ইজতিহাদ হলো ধারণা (Zanni)। অকাট্য দলিলের সামনে ধারণা টেকে না।

২. ইজমার বিরোধী হলে (مخالفة الإجماع):

মুসলিম উম্মাহর ঐকমত্য বা ইজমার বিপরীতে যদি কোনো রায় দেওয়া হয়, তবে তা বাতিলযোগ্য। যেমন: কেউ যদি রায় দেয় যে, দাদির বর্তমানে নানি মিরাস পাবে, তবে তা বাতিল হবে।

৩. প্রকাশ্য কিয়াসের বিরোধী হলে (مخالفة القياس الجلي):

যদি রায়টি এমন কোনো কিয়াসের বিরোধী হয় যা খুবই স্পষ্ট এবং যার কোনো শক্তিশালী দলিল নেই, তবে তা বাতিল করা হবে।

বিচারক কখন রায় বাতিল করতে পারেন?

একজন বিচারক (Qadi) অন্য বিচারকের বা নিজের পূর্বের রায় বাতিল করতে পারেন, যদি তা নিম্নোক্ত শর্তের মধ্যে পড়ে:

- রায়টি যদি শরীয়তের অকাট্য বিধান (নস বা ইজমা) লঙ্ঘন করে।
- বিচারক যদি অযোগ্য হন (ইজতিহাদের যোগ্যতা না থাকে)।
- রায়ে যদি কোনো প্রকাশ্য ভুল (খাতায়ে ফাহেশ) থাকে যা উপেক্ষা করা অসম্ভব।

ইবারত বা ফিকহী উসূল:

"كُلُّ قَاضٍ قَضَى بِجَوْرِ أَوْ بِخِلَافِ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ فَقَضَاؤُهُ مَرْدُودٌ"

অর্থ: "প্রত্যেক বিচারক যিনি অন্যায়ভাবে অথবা নস, ইজমা বা প্রকাশ্য কিয়াসের খেলাফে ফয়সালা দেন, তাঁর ফয়সালা প্রত্যাখ্যাত হবে।"

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, ইজতিহাদের সম্মান ততক্ষণ বজায় থাকে যতক্ষণ তা শরীয়তের মূল কাঠামোর ভেতরে থাকে। কিন্তু যখন তা স্পষ্ট দলিল বা ঐশী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সেই ইজতিহাদ ভেঙে দেওয়া বা নাকচ করা ওয়াজিব হয়ে দাঁড়ায়।

القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

দ্বিতীয় কায়দা: যখন হালাল ও হারাম একত্রিত হয়, তখন হারাম প্রাধান্য পায়।

প্রশ্ন-৪: “ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু গালাবাল হারাম” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এর শরয়ী প্রজ্ঞার কারণ কী?

اشرح مدلول قاعدة : "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"، وما هي (حكمتها التشريعية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরিয়তের সতর্কতার অন্যতম একটি মূলনীতি হলো ‘ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু গালাবাল হারাম’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) তাঁর ‘আল আশবাহ ওয়ান নাযাইর’ গ্রন্থে এই কায়দাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। মানুষের ইবাদত ও মুয়ামালাতকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য এই কায়দাটি অপরিহার্য।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- ইজতামাআ (اجتمع): একত্রিত হওয়া বা মিশ্রিত হওয়া।
- হালাল ও হারাম (الحلال والحرام): বৈধ ও অবৈধ বস্তু।
- গালাবা (غلب): বিজয়ী হওয়া বা প্রাধান্য পাওয়া।

মর্মার্থ: যখন কোনো বিষয়ে হালাল (বৈধতা) এবং হারাম (অবৈধতা) একত্রিত হয় এবং দুটিকে পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে, তখন হারামের দিকটিই প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ, সতর্কতা হিসেবে ওই বস্তুটি পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হবে।

শরয়ী প্রজ্ঞা বা হিকমত (الحكمة التشريعية):

এই কায়দার পেছনে মূল শরয়ী প্রজ্ঞা হলো: ‘ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা উপকার লাভের চেয়ে অগ্রগণ্য’ (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)।

১. পাপ থেকে সুরক্ষা: হারামের সাথে সামান্যতম সম্পৃক্ততাও মানুষের দ্বীনকে কলুষিত করতে পারে। তাই হালাল নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকাই নিরাপদ।

২. সন্দেহ দূরীকরণ: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে দাও, যা সন্দেহে ফেলে না তার দিকে ধাবিত হও।” (তিরমিজি)। এই কায়দাটি মুমিনকে সংশয়মুক্ত জীবনযাপনে সহায়তা করে।

উদাহরণ (أمثلة):

যদি এমন কোনো পশু জবেহ করা হয় যার জবেহকারী মুসলিম নাকি অগ্নিপূজক তা জানা যাচ্ছে না (হালাল ও হারামের মিশ্রণ), তবে সেই পশুর গোশত খাওয়া হারাম হবে। কারণ এখানে হারামের দিকটি প্রাধান্য পাবে।

উপসংহার (خاتمة):

শরিয়তের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পবিত্র রাখা। তাই হালাল ও হারামের সংমিশ্রণে হারামকে প্রাধান্য দিয়ে শরিয়ত মানুষকে নিশ্চিত গুনাহ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।

প্রশ্ন-৫: এ কায়দা প্রয়োগের শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, এবং হালাল ও হারামের উভয় পক্ষের মধ্যে সমতা কি শর্ত?

بين شروط تطبيق هذه القاعدة، وهل يشترط التساوي بين جهتي الحل (والحرمة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘হালাল ও হারাম একত্রিত হলে হারাম প্রবল হয়’—এই কায়দাটি ঢালাওভাবে সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এর প্রয়োগের জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত উল্লেখ করেছেন।

কায়দা প্রয়োগের শর্তাবলি (شروط التطبيق):

১. পৃথকীকরণে অক্ষমতা: হালাল এবং হারাম বস্তু এমনভাবে মিশে যেতে হবে যে, একটিকে অপরটি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। যদি আলাদা করা যায়, তবে হারামটি ফেলে দিয়ে হালালটি ব্যবহার করা বৈধ।

২. দলিলের বিদ্যমানতা: হারামের বিষয়টি নিছক ধারণা নয়, বরং দলিলের ভিত্তিতে বা বাস্তবতার আলোকে নিশ্চিত হতে হবে।

৩. সরাসরি সংমিশ্রণ: হালাল ও হারামের কারণগুলো একই বস্তুতে বা ঘটনায় সরাসরি যুক্ত হতে হবে।

উভয় পক্ষের সমতা বা তারতম্য (مسألة التساوي):

প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়েছে, হালাল ও হারামের মধ্যে সংখ্যার বা পরিমাণের সমতা (Tasaawi) শর্ত কি না?

- **সমতার ক্ষেত্রে:** যদি হালাল ও হারাম সমান সমান হয় (৫০%-৫০%), তবে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম প্রাধান্য পাবে এবং তা বর্জন করতে হবে।
- **হারাম কম হলে:** যদি হালাল বস্তুর পরিমাণ বেশি হয় এবং হারাম কম হয় (যেমন: এক বালতি দুধে এক ফোঁটা রক্ত), তবুও হারাম প্রাধান্য পাবে এবং পুরো বস্তুটি নাপাক বা হারাম হয়ে যাবে।
- **ব্যতিক্রম:** তবে ‘উমুমে বালওয়া’ বা যা থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর, এমন ক্ষেত্রে (যেমন: রাস্তার কাদা যা নাপাক হতে পারে) হারামের চেয়ে হালালের ব্যাপকতা বা প্রয়োজনের তাগিদে শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়।

মূল কথা হলো: সংখ্যার চেয়ে এখানে ‘হারামের অস্তিত্ব’ মুখ্য। হারাম সামান্য হলেও তা হালালের পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, এই কায়দা প্রয়োগের জন্য হালাল ও হারামের সমতা শর্ত নয়; বরং হারামের নিশ্চিত উপস্থিতিই হালালকে নিষিদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট, যতক্ষণ না তা পৃথক করা যায়।

প্রশ্ন-৬: “ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু...” এ কায়দার অধীনে আসা শাখা কায়দাগুলো উল্লেখ কর। যেমন: “ফিল হালে ওয়াল হুরমাতি” (হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে সতর্কতা)।

(اذكر القواعد الفرعية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: "احتياط في الحل (والحرمة)")

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

দ্বিতীয় মূলনীতি ‘ইজা ইজতামাআল হালালু ওয়াল হারামু গালাবাল হারাম’-এর অধীনে বেশ কিছু উপ-নীতি বা শাখা কায়দা (Qawaid Fariyyah) রয়েছে, যা ফিকহি মাসআলা সমাধানে ব্যবহৃত হয়।

শাখা কায়দাসমূহ (القواعد الفرعية):

১. হালাল ও হারামের ক্ষেত্রে সতর্কতা (والحرمة الحل في احتياط):

প্রশ্নে উল্লিখিত এই উপ-নীতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর অর্থ হলো, যখন কোনো বস্তুর বৈধতা ও অবৈধতা নিয়ে দলিল পরস্পর বিরোধী হয় অথবা অস্পষ্টতা তৈরি হয়, তখন সতর্কতা (Ihtiyat) অবলম্বন করে সেটাকে হারাম গণ্য করা উত্তম।

- **উদাহরণ:** শিকারের ক্ষেত্রে—কেউ শিকার লক্ষ্য করে তীর মারল, কিন্তু শিকারটি পানিতে পড়ে মারা গেল। এখানে তীর দ্বারা মৃত্যু (হালাল) এবং পানিতে ডুবে মৃত্যু (হারাম) একত্রিত হয়েছে। সতর্কতা হিসেবে এই শিকার খাওয়া হারাম।

২. সন্দেহের কারণে মহিলারা হারাম হয় (شبهة بأدنى تحرم الفروج):

বিবাহ এবং লজ্জাস্থানের (Furooj) ব্যাপারে শরিয়ত সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে।

- **উদাহরণ:** যদি কোনো ব্যক্তির মনে সন্দেহ জাগে যে, তার স্ত্রী তার দুধ-বোন হতে পারে এবং এর স্বপক্ষে কিছু আলামত পাওয়া যায়, তবে সতর্কতা হিসেবে বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পর্ক স্থাপন না করাই বিধান। এখানে হারামের সম্ভাবনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৩. মূলে হারাম থাকলে তা প্রবল হয় (التَّبْذِيعُ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْأَشْيَاءِ فِي الْأَصْلِ) (واللحوم):

সাধারণ বস্তুর ক্ষেত্রে মূল হলো বৈধতা, কিন্তু গোশত এবং নারীদের (বিবাহ) ক্ষেত্রে মূল হলো নিষেধাজ্ঞা (হারাম), যতক্ষণ না হালাল হওয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়।

- **উদাহরণ:** কোনো পশুর গোশত সম্পর্কে যদি সন্দেহ হয় যে এটি শরিয়তসম্মতভাবে জবেহ হয়েছে কি না, তবে তা হারাম হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার (خاتمة):

এই শাখা কায়দাগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি শরিয়ত হারাম থেকে বাঁচার জন্য ‘সাদদে জারাই’ বা প্রিভেন্টিভ মেজারস গ্রহণ করে। বিশেষত খাদ্য ও বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই কায়দার প্রয়োগ অত্যন্ত কঠোর ও সতর্কতাপূর্ণ।

القاعدة الثالثة : هل يكره الإيثار بالقرب؟

তৃতীয় কায়দা: ইবাদতে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ।

প্রশ্ন-৭: “হাল ইউকরাহুল ঈসারু বিল কুরাব?” (ইবাদতে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ কি না?) কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত কী?

اشرح مدلول قاعدة: "هل يكره الإيثار بالقرب؟" وما هو الرأي المعتمد في (المذهب الحنفي حول هذه المسألة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামে ত্যাগের মহিমা অপরিসীম। তবে ইবাদত বা নেক কাজের ক্ষেত্রে অন্যকে সুযোগ দিতে গিয়ে নিজের সওয়াব ত্যাগ করা কতটা যৌক্তিক, তা নিয়ে ফিকহ শাস্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কায়দা রয়েছে: ‘হাল ইউকরাহুল ঈসারু বিল কুরাব?’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এ বিষয়ে হানাফী মাযহাবের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন।

সংজ্ঞা ও তাৎপর্য (التعريف والمدلول):

- ঈসার (الإيثار): অর্থ হলো অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দেওয়া। নিজের প্রয়োজন বা অধিকার ত্যাগ করে অন্যকে সুযোগ দেওয়া।
- কুরাব (القرب): ‘কুরবাতুন’-এর বহুবচন। অর্থ হলো নৈকট্য বা ইবাদত, যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা হয়।

তাৎপর্য: জাগতিক বা দুনিয়াবী বিষয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মহৎ গুণ। কিন্তু পরকালীন মুক্তি বা সওয়াবের কাজে (যেমন: নামাজের প্রথম কাতারে দাঁড়ানো) অন্যকে নিজের জায়গায় সুযোগ দিয়ে নিজে পেছনে সরে যাওয়া কি বৈধ? এই কায়দাটি মূলত এই প্রশ্নেরই সমাধান দেয়।

হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত (الرأي المعتمد):

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, “ইবাদত বা দ্বীনী বিষয়ে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মাকরুহ (অপছন্দনীয়)।”

কারণ:

১. আল্লাহ তাআলা নেক কাজের প্রতিযোগিতার নির্দেশ দিয়েছেন (ফাসতাবিকুল খাইরাত)।

২. ইবাদতে অন্যকে সুযোগ দেওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে নিজেকে বিমুখ করা বা নিজেকে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা, যা শরিয়তে কাম্য নয়।

৩. সওয়াবের কাঙাল হওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য, এখানে ত্যাগ স্বীকার করা বোকামি।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হলো—ইবাদতের ক্ষেত্রে স্বার্থপরের মতো ‘লোভী’ হওয়াই কাম্য। এখানে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া বিনয় নয়, বরং অবহেলা।

প্রশ্ন-৮: আল্লাহর হক (ইবাদত) এবং মানুষের হক (মুয়ামালাত)-এর ক্ষেত্রে পার্থক্যের বিধান সুস্পষ্ট কর।

(بين الفرق بين الإيثار في حقوق الله (العبادات) وحقوق الأدميين (المعاملات) وحكم كل منهما)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘ঈসার’ বা ত্যাগের বিধান সব ক্ষেত্রে এক নয়। শরিয়ত এটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে: আল্লাহর হক (ইবাদত) এবং বান্দার হক (জাগতিক লেনদেন)। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই পার্থক্যটি অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পার্থক্য ও বিধানের ছক (الجدول للفرق):

বিষয়	ইবাদত বা আল্লাহর হক (في العبادات)	মুয়ামালাত বা বান্দার হক (في المعاملات)
উদাহরণ	নামাজের প্রথম কাতার ছেড়ে দেওয়া, ওজুর পানি অন্যকে দিয়ে দেওয়া।	ক্ষুধার্তকে নিজের খাবার দেওয়া, নিজের সিট বা বসার জায়গা অন্যকে দেওয়া।
শরিয়তের হুকুম	মাকরুহ (অপছন্দনীয়)।	মুস্তাহাব ও সুন্নাহ (প্রশংসনীয়)।
মূলনীতি	আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে কারো মুখাপেক্ষী হওয়া বা পিছিয়ে থাকা উচিত নয়।	দুনিয়াবী স্বার্থ ত্যাগের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ববোধ ও মহানুভবতা প্রকাশ পায়।
দলিল/ভিত্তি	আল্লাহ বলেন: “তোমরা কল্যাণকর কাজে প্রতিযোগিতা কর।”	আল্লাহ আনসারদের প্রশংসা করেছেন: “তারা নিজেদের ওপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়, যদিও তাদের অভাব থাকে।” (সূরা হাশর: ৯)

ব্যাখ্যা:

১. ইবাদতে (দ্বীনী কাজ): এখানে অন্যকে সুযোগ দেওয়া মানে নিজের আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই এটি মাকরুহ।

২. মুয়ামালাতে (দুনিয়াবী কাজ): এখানে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে অন্যের উপকার করা সর্বোচ্চ ত্যাগের নিদর্শন এবং এটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, আখেরাতের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে হবে (লোভী হতে হবে), আর দুনিয়ার ব্যাপারে ত্যাগী হতে হবে। এটিই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা।

প্রশ্ন-৯: “হাল ইউকরাহুল ইসারু বিল কুরাব?” এ কায়দা সংশ্লিষ্ট ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন প্রথম কাতারে বা সদকার ক্ষেত্রে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة، مثل: تقديم الغير في (الصف الأول أو الصدقة)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

এই কায়দাটি ইবাদত ও মুয়ামালাতের সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করে। ফিকহুল হানাফীতে এর বহু প্রয়োগ (Furu) রয়েছে। নিম্নে তিনটি প্রধান ফিকহি উদাহরণ আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. নামাজের প্রথম কাতার (الصف الأول):

কোনো ব্যক্তি মসজিদে আগে এসে প্রথম কাতারে বসল। এরপর সম্মানিত বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেউ আসলে সে তাকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে পেছনে চলে গেল।

- **হুকুম:** এটি মাকরুহ। কারণ, প্রথম কাতারের সওয়াব অনেক বেশি। হাদিসে প্রথম কাতারের জন্য লটারি করার কথাও বলা হয়েছে। স্বেচ্ছায় এই সওয়াব ছেড়ে দেওয়া আধ্যাত্মিক নিবুদ্দিতার শামিল।

২. ওজুর পানি (ماء الوضوء):

সফরে বা অন্য কোনো অবস্থায় পানি কম। একজনের ওজু করার মতো পানি আছে।

- **হুকুম:** এমতাবস্থায় নিজের পানি অন্য সঙ্গীকে দান করে নিজে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয় (মাকরুহ)। কারণ, পানি দিয়ে ওজু করা তায়াম্মুমের চেয়ে উত্তম এবং এটি আল্লাহর হক। এখানে অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া মানে পরিপূর্ণ পবিত্রতার সওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত করা।

৩. সদকা বা দান (الصدقة):

সদকার বিষয়টি একটু ভিন্ন। সদকা দেওয়া একটি ইবাদত, আবার এটি অন্যের উপকারও (মুয়ামালাত)।

- **হুকুম:** যদি নিজের খুব প্রয়োজন থাকে এবং হাতে সামান্য খাবার বা অর্থ থাকে, তবে তা অন্যকে দিয়ে দেওয়া ‘ঈসার’ বা ত্যাগের সর্বোচ্চ চূড়া

হিসেবে গণ্য হবে (যদি সবার করার ক্ষমতা থাকে)। এটি ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও মুস্তাহাব, কারণ এর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বান্দার উপকারের সাথে। প্রশ্নে উল্লিখিত সদকার উদাহরণটি মূলত দুনিয়াবী ত্যাগের ক্যাটাগরিতে পড়ে, যা প্রশংসনীয়।

উপসংহার (خاتمة):

উপরোক্ত উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, যেই কাজে সরাসরি আল্লাহর নৈকট্য ও সওয়াব জড়িত (যেমন নামাজ, ওজু), সেখানে কাউকে ছাড় দেওয়া যাবে না। আর যেখানে মানুষের উপকার জড়িত (যেমন খাদ্য, অর্থ), সেখানে ছাড় দেওয়া উত্তম।

القاعدة الرابعة : التابع تابع

চতুর্থ কায়দা: আনুষঙ্গিক বিষয় মূলের অনুগামী হয়

প্রশ্ন-১০: “আত্তাবিউ তাবি” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরয়ী বিধানে এর প্রমাণ কী?

(اشرح مدلول قاعدة: "التابع تابع" وما هي حجيتها في الأحكام الشرعية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম একটি বুনয়াদী কায়দা হলো ‘আত্তাবিউ তাবি’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর মতে, লেনদেন, চুক্তি এবং মালিকানার ক্ষেত্রে এই কায়দাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূল বস্তুর হুকুম সাব্যস্ত হলে আনুষঙ্গিক বস্তুর হুকুমও আপনা-আপনি সাব্যস্ত হয়ে যায়।

সংজ্ঞা ও মর্মার্থ (التعريف والمدلول):

- আত্তাবিউ (التابع): অনুগামী বা আনুষঙ্গিক বিষয়, যার নিজস্ব কোনো স্বতন্ত্র সত্তা ধর্তব্য নয়।
- তাবি (تابع): অনুসরণকারী।

তাৎপর্য: কোনো বস্তু যখন মূল বস্তুর (মাতবু) সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে তাকে পৃথক করা যায় না, তখন মূল বস্তুর ওপর যে হুকুম বা বিধান আরোপিত হয়, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনুষঙ্গিক বস্তুর ওপরও বর্তায়। আনুষঙ্গিক বস্তুর জন্য আলাদা চুক্তির প্রয়োজন হয় না।

ফিকহি উসুল:

"التابع لا يفرد بالحكم"

অর্থ: “আনুষঙ্গিক বা অনুগামী বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র কোনো হুকুম বা বিধান দেওয়া হয় না।”

শরয়ী দলিল/ভিত্তি (الحجية الشرعية):

এই কায়দার ভিত্তি হলো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদিস ও ফিকহি ইজমা।

হাদিসে এসেছে:

ذَكَاهُ الْجَنِينِ ذَكَاهُ أُمِّهِ

অর্থ: “গর্ভস্থ সন্তানের (পশুর বাচ্চার) জবেহ তার মায়ের জবেহ করার মাধ্যমেই হয়ে যায়।” (আবু দাউদ)

এখানে মায়ের জবেহ (মূল) হওয়ার সাথে সাথে পেটের বাচ্চা (আনুষঙ্গিক) জবেহ হয়েছে বলে গণ্য হয়। এটিই এই কায়দার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল বস্তুর অস্তিত্ব বা লয় হলে আনুষঙ্গিক বিষয়ও তার অনুগামী হয়। একে আলাদা করা যায় না।

প্রশ্ন-১১: বিক্রয় এবং চুক্তির ক্ষেত্রে এই কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা সুস্পষ্ট কর? মূল বস্তুর সাথে আনুষঙ্গিক বস্তু অন্তর্ভুক্ত হওয়ার একটি উদাহরণ দাও।

بين كيف تطبق هذه القاعدة في باب البيع والعقود؟ اذكر مثالا على دخول (التابع في المتبوع)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ক্রয়-বিক্রয় (বাই) ও চুক্তির (আকদ) ক্ষেত্রে ‘আত্তাবিউ তাবি’ কায়দাটির ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে। অনেক সময় ক্রেতা ও বিক্রেতা মূল পণ্য নিয়ে কথা বলেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করেন না। এমতাবস্থায় এই কায়দা বিবাদ নিরসন করে।

প্রয়োগক্ষেত্র (التطبيق في البيع):

বিক্রয় চুক্তিতে মূল বস্তু উল্লেখ করলেই আনুষঙ্গিক বস্তু বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আলাদা করে নাম উল্লেখ করার দরকার নেই।

- **নিয়ম:** যদি কেউ কোনো বস্তু বিক্রি করে, তবে শরিয়ত ও প্রথা (উরফ) অনুযায়ী যা যা ওই বস্তুর অপরিহার্য অংশ বা প্রয়োজন, তা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে।

উদাহরণ (أمثلة):

১. তালা ও চাবি (القفل والمفتاح): কেউ যদি একটি তালা বিক্রি করে, তবে চাবি উল্লেখ না করলেও তা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ চাবি হলো তালায় 'তাবি' (অনুসরণকারী)। চাবি ছাড়া তালা অকেজো।

২. গবাদি পশু (الحيوان الحامل): গর্ভবতী গাভী বিক্রি করলে পেটের বাচ্চা আলাদা মূল্য বা চুক্তি ছাড়াই ক্রেতার মালিকানাতে চলে যাবে। কারণ বাচ্চা মায়ের 'তাবি'।

৩. জমির অধিকার: বাড়ি বিক্রি করলে বাড়ির রাস্তায় চলাচলের অধিকার (হক-ই-মুরুর) স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রেতার প্রাপ্য হয়।

উপসংহার (خاتمة):

চুক্তির সময় আনুষঙ্গিক বিষয় উল্লেখ না থাকলেও তা মূল বিষয়ের সাথে যুক্ত হয়ে হস্তান্তরিত হয়। এটিই এই কায়দার মূল দাবি।

প্রশ্ন-১২: উদ্দেশ্য ও প্রথা অনুসারে, যে আনুষঙ্গিক বিষয়টি বিধানে গ্রহণযোগ্য এবং যা গ্রহণযোগ্য নয়, তার মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

وضح الفرق بين التابع الذي يعتد به في الحكم والتابع الذي لا يعتد به، وفقا (للمقاصد والعرف)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সব আনুষঙ্গিক বস্তু এক রকম নয়। কিছু বস্তু মূলের সাথে এমনভাবে মিশে থাকে যা আলাদা করা যায় না, আবার কিছু আলাদা করা যায়। উরফ (প্রথা) ও মাকাসিদ (উদ্দেশ্য) এর ওপর ভিত্তি করে এর পার্থক্য নির্ণয় করা হয়।

পার্থক্য (الفرق):

বিষয়	গ্রহণযোগ্য আনুষঙ্গিক (التابع المعتمد به)	অগ্রহণযোগ্য আনুষঙ্গিক (التابع غير المعتمد به)
সংজ্ঞা	যা মূল বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্য বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত।	যা মূল বস্তুর সাথে সংযুক্ত থাকলেও সহজে পৃথক করা যায় বা স্থায়ী নয়।

উরফ বা প্রথা	সামাজিকভাবে এটি মূল বস্তুর অংশ মনে করা হয়।	সামাজিকভাবে এটি আলাদা সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়।
বিধান	উল্লেখ না করলেও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।	উল্লেখ না করলে চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয় না।
উদাহরণ	১. বাড়ি বিক্রির সময় দেয়াল, ছাদ ও স্থায়ী দরজা-জানালা। ২. পশুর পেটের বাচ্চা।	১. বাড়ির ভেতরের আসবাবপত্র (খাট, আলমারি)। ২. গাছে ঝুলে থাকা পাকা ফল (ইমাম আবু হানিফার মতে উল্লেখ না করলে ফল অন্তর্ভুক্ত হয় না)।

বিশ্লেষণ:

- **উদ্দেশ্য (Maqasid):** যদি আনুষঙ্গিক বিষয়টি ছাড়া মূল বস্তুর উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয় (যেমন: চাবি ছাড়া তালা), তবে তা গ্রহণযোগ্য।
- **প্রথা (Urf):** সমাজের মানুষ যদি কোনো জিনিসকে মূলের অংশ মনে করে, তবে শরিয়তও সেটাকে অংশ মনে করে।

উপসংহার (خاتمة):

যে ‘তাবি’ বা অনুগামী বিষয়টি মূল থেকে পৃথক করলে মূলের ক্ষতি হয় বা প্রথানুযায়ী তা অংশের মতো, কেবল সেটিই এই কায়দার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন-১৩: “আত্তাবিউ তাবি” এ কায়দা সংশ্লিষ্ট ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন দান বা ওয়াকফের উপর আনুষঙ্গিক বস্তুর প্রভাব।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية المتعلقة بهذه القاعدة، مثل: أثر التابع في (الهبة أو الوقف)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘আত্তাবিউ তাবি’ কায়দাটি শুধুমাত্র ক্রয়-বিক্রয়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দান (হেবা), ওয়াকফ এবং বন্ধক (রাহন)-এর ক্ষেত্রেও এর বিধান কার্যকর। নিচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি শাখা (Furu) আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. দানের ক্ষেত্রে (في الهبة):

যদি কোনো ব্যক্তি একটি জমি কাউকে দান (হেবা) করে, তবে ওই জমিতে থাকা স্থায়ী গাছপালাও দানের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও দাতা মুখে গাছের কথা উল্লেখ না করেন। কারণ জমির সাথে গাছ ‘তাবি’ বা অনুগামী হিসেবে গণ্য।

২. ওয়াকফের ক্ষেত্রে (في الوقف):

কেউ যদি একটি বাড়ি আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে, তবে বাড়ির সাথে লাগানো পানির লাইন, বিদ্যুতের সংযোগ এবং স্থায়ী ফিক্সচারগুলোও ওয়াকফ হয়ে যাবে। এগুলো আলাদা করে ওয়াকফ করার প্রয়োজন নেই। কারণ এগুলো বাড়ির অস্তিত্ব ও ব্যবহারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৩. ঋণ বা মুক্তির ক্ষেত্রে (في العتق):

যদি কোনো মনিব তার গর্ভবতী দাসীকে আজাদ (মুক্ত) করে দেয়, তবে তার পেটের সন্তানও আজাদ হয়ে যাবে। কারণ মায়ের স্বাধীনতার হুকুম সন্তানের ওপরও বর্তায়। সন্তান এখানে মায়ের অনুগামী।

উপসংহার (خاتمة):

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, শরিয়তের বিধানে মূল বিষয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আলাদা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, বরং তা মূলের সাথেই কার্যকর হয়।

القاعدة الخامسة : تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

পঞ্চম কায়দা: প্রজাদের ওপর শাসকের পদক্ষেপ জনকল্যাণনির্ভর হতে হবে

প্রশ্ন-১৪: “তাসাররুফুল ইমামি আলার রায়িয়াতি মানুতুন বিল মাসলাহা” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূল ভিত্তি কী?

اشرح مدلول قاعدة : "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" وما هو (مستندها الأصلي في الشريعة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনিক ফিকহ-এর একটি স্বর্ণালী মূলনীতি হলো ‘তাসাররুফুল ইমামি আলার রায়িয়াতি মানুতুন বিল মাসলাহা’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এবং আল্লামা সুযুতী (রহ.) উভয়েই এই কায়দাকে শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতা রোধের মূল হাতিয়ার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শাসকের প্রতিটি পদক্ষেপ জনগণের কল্যাণে হতে হবে—এটিই এই কায়দার সারমর্ম।

সংজ্ঞা ও মর্মার্থ (التعريف والمدلول):

- তাসাররুফ (تصرف): আচরণ, পদক্ষেপ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
- ইমাম (الإمام): রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তি।
- মানুতুন (منوط): শর্তযুক্ত, নির্ভরশীল বা আবদ্ধ।
- মাসলাহা (المصلحة): জনকল্যাণ বা প্রজা সাধারণের স্বার্থ।

মর্মার্থ: রাষ্ট্রপ্রধান বা শাসকের ক্ষমতা ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং জনগণের ওপর তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ কার্যকর হতে হলে তাতে অবশ্যই জনস্বার্থ (Public Interest) নিহিত থাকতে হবে। যদি কোনো সিদ্ধান্তে জনগণের কল্যাণ না থাকে, তবে শাসকের সেই সিদ্ধান্ত শরীয়তে বৈধ নয়।

শরয়ী দলিল/ভিত্তি (المستند الأصلي):

এই কায়দাটির মূল ভিত্তি হলো হাদিস ও ফিকহী ইজমা।

১. হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

অর্থ: “তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

২. উসুল: শাফেয়ী ইমামগণের মতে—

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَّةِ مَنَزَلَةُ الْوَلِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

অর্থ: “প্রজাদের ওপর শাসকের অবস্থান হলো এতিমের ওপর অভিভাবকের মতো।”

অর্থাৎ, অভিভাবক যেমন এতিমের মালের ক্ষতি করতে পারে না বরং কেবল ভালোর জন্যই ব্যয় করে, শাসকের দায়িত্বও তদ্রূপ।

উপসংহার (خاتمة):

শাসক জনগণের সেবক, মালিক নয়। তাই তার প্রতিটি কলমের খোঁচা বা মুখের আদেশ জনস্বার্থের অনুকূলে হতে হবে। জনস্বার্থ বিরোধী কোনো আদেশ শরিয়তে বাতিল বলে গণ্য।

প্রশ্ন-১৫: জনস্বার্থের প্রতি বাধ্যবাধকতার দিক থেকে শাসকের কাজ এবং সাধারণ ব্যক্তির কাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।

(بين الفرق بين تصرف الإمام (الحاكم) وتصرف الفرد (الشخص العادي))
(من حيث الالتزام بالمصلحة)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘মাসলাহা’ বা স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ ব্যক্তি (Private Individual) এবং একজন শাসক (Public Authority) এর এখতিয়ারে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। শাসক চাইলেই সাধারণ মানুষের মতো দান-খয়রাত বা ছাড় দিতে পারেন না।

পার্থক্য (الفرق):

বিষয়	সাধারণ ব্যক্তি (الشخص العادي)	শাসক বা ইমাম (الإمام/الحاكم)
স্বাধীনতার মাত্রা	নিজ সম্পদে পূর্ণ স্বাধীন।	রাষ্ট্রীয় সম্পদে আমানতদার মাত্র, স্বাধীন নন।
মাসলাহা বা স্বার্থ	নিজের স্বার্থ ত্যাগ করতে পারেন। ইচ্ছা হলে ক্ষতি মেনে নিয়ে কম দামে পণ্য বিক্রি করতে পারেন।	কেবল জনস্বার্থ নিশ্চিত করতে বাধ্য। রাষ্ট্রীয় সম্পদ কম দামে বিক্রি বা বিনা কারণে কাউকে দেওয়া হারাম।
বাধ্যবাধকতা	‘খিয়ার’ বা ইচ্ছাধিকার আছে। তিনি চাইলে অধিকার ছেড়ে দিতে পারেন।	‘মাসলাহা’ বা জনকল্যাণ অপরিহার্য। কল্যাণ ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেওয়া তার জন্য জায়েজ নেই।
উদাহরণ	নিজের পাওনা ঋণ মাফ করে দেওয়া জায়েজ।	রাষ্ট্রের পাওনা (যেমন: ট্যাক্স বা জিজিয়া) বিনা কারণে মাফ করা জায়েজ নেই, কারণ এটি জনগণের হক।

বিশ্লেষণ:

সাধারণ মানুষ নিজের মালিকানাধীন বস্তুর ওপর ‘মুবা’ (বৈধ) কাজ করতে পারেন, তাতে লাভ হোক বা না হোক। কিন্তু শাসককে অবশ্যই ‘আল-আসলহ’ (সর্বোত্তমটি) গ্রহণ করতে হবে। দুটি বৈধ পথের মধ্যে যেটি জনগণের জন্য বেশি উপকারী, শাসক সেটি গ্রহণ করতে বাধ্য।

উপসংহার (خاتمة):

ব্যক্তির কাজ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, আর শাসকের কাজ কল্যাণের ওপর নির্ভরশীল। এটিই ফিকহী রাজনীতির মূল পার্থক্য।

প্রশ্ন-১৬: “তাসাররুফুল ইমামি...” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন মূল্য নির্ধারণ বা কর আরোপ করা ।
(اذكر ثلاثا من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: تحديد)
(الأسعار أو فرض الضرائب)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

শাসকের প্রতিটি পদক্ষেপ জনকল্যাণে হতে হবে—এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ফিকহ শাস্ত্রের রাষ্ট্রীয় অধ্যায়ের বহু মাসআলা সমাধান করা হয়েছে। নিচে তিনটি প্রধান ফিকহি প্রয়োগ (Furu) আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. মূল্য নির্ধারণ (التسعير):

স্বাভাবিক অবস্থায় শাসকের জন্য বাজারের পণ্যের দাম নির্ধারণ (ফিক্সিং) করা জায়েজ নেই, কারণ এতে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হতে পারে।

- **তবে:** যদি ব্যবসায়ীরা সিডিকেট করে বা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে দাম বাড়িয়ে দেয় এবং তাতে সাধারণ মানুষের কষ্ট (আম দাল-দরার) হয়, তবে শাসক ‘জনস্বার্থে’ পণ্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এখানে ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে জনস্বার্থ (মাসলাহা) অগ্রাধিকার পাবে।

২. কর বা ট্যাক্স আরোপ (فرض الضرائب):

স্বাভাবিক অবস্থায় জনগণের ওপর অতিরিক্ত কর চাপানো হারাম।

- **কিন্তু:** যদি বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) শূন্য হয়ে যায় এবং দেশের প্রতিরক্ষা বা জরুরি প্রয়োজনে অর্থের দরকার হয়, তবে শাসক ধনীদের ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স আরোপ করতে পারেন। শর্ত হলো, এই টাকা যেন সত্যিকার অর্থেই জননিরাপত্তায় ব্যয় হয়। এটি ‘মাসলাহা’ বা বৃহত্তর স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. অযোগ্যকে নিয়োগ দান (تولية غير الأصلح):

শাসক যদি কোনো সরকারি পদে কাউকে নিয়োগ দেন, তবে তাকে অবশ্যই যোগ্যতা ও আমানতদারিতার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।

- **হুকুম:** আত্মীয়প্রীতি করে বা ঘুষ নিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া শাসকের জন্য হারাম এবং ওই নিয়োগ বাতিলযোগ্য। কারণ এতে ‘জনস্বার্থ’ ক্ষুণ্ণ হয় এবং রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়। শাসকের দায়িত্ব হলো—সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে খুঁজে বের করা।

উপসংহার (خاتمة):

রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টন, যুদ্ধ ঘোষণা, সন্ধি করা বা আইন প্রণয়ন—সব ক্ষেত্রেই এই কায়দাটি শাসকের জন্য গাইডলাইন। জনস্বার্থ নেই এমন যেকোনো কাজ শাসকের জন্য শরিয়তসম্মত নয়।

القاعدة السادسة : الحدود تدرأ بالشبهات

ষষ্ঠ কায়দা: সন্দেহের কারণে হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি) রহিত হয়ে যায়

প্রশ্ন-১৭: “আল হুদুদু তুদরাউ বিশ শুবহাত” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং সুন্নাহ থেকে এর মূল দলিল কী?

اشرح مدلول قاعدة : "الحدود تدرأ بالشبهات"، وما هو دليلها الأصلي من (السنة النبوية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি ফৌজদারি আইনের (Criminal Law) একটি যুগান্তকারী ও মানবিক মূলনীতি হলো ‘আল হুদুদু তুদরাউ বিশ শুবহাত’। অপরাধ প্রমাণে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইসলামি শরিয়ত কঠোর শাস্তি (হুদুদ) প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাকে ন্যায়বিচারের রক্ষাকবচ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

সংজ্ঞা ও মর্মার্থ (التعريف والمدلول):

- আল-হুদুদ (الحدود): ‘হুদুদ’-এর বহুবচন। এর অর্থ হলো শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট শাস্তি (যেমন: চুরির জন্য হাত কাটা, জিনার জন্য বেত্রাঘাত বা রজম)।
- তুদরাউ (تدرأ): প্রতিহত করা হয়, রহিত করা হয় বা দূর করা হয়।
- বিশ-শুবহাত (بالشبهات): ‘শুবহাহ’-এর বহুবচন। অর্থ হলো সংশয়, সন্দেহ বা অস্পষ্টতা।

মর্মার্থ: কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে হুদুদ বা নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করার জন্য অপরাধটি অকাট্য দলিলে (সুনিশ্চিতভাবে) প্রমাণিত হতে হবে। যদি অপরাধ প্রমাণে বা অপরাধীর নিয়তে কোনো প্রকার যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ (Reasonable Doubt) পাওয়া যায়, তবে তার ওপর হুদুদ জারি হবে না। বরং লঘু শাস্তি বা তা’যির (Tazir) প্রয়োগ হতে পারে।

সুন্নাহ থেকে দলিল (الدليل من السنة):

এই কায়দাটি সরাসরি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একাধিক হাদিস থেকে গৃহীত।

১. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

ادْرَأُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ
الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

অর্থ: “তোমরা মুসলিমদের ওপর থেকে সাধ্যমতো হুদুদ (শাস্তি) রহিত কর। যদি অপরাধীর মুক্তির কোনো পথ (সন্দেহ) থাকে, তবে তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, শাসকের ক্ষমার ক্ষেত্রে ভুল করা শাস্তির ক্ষেত্রে ভুল করার চেয়ে উত্তম।” (তিরমিজি)

উপসংহার (خاتمة):

“সন্দেহবশত খালাস পাওয়া সন্দেহবশত শাস্তি পাওয়ার চেয়ে শ্রেয়”—আধুনিক আইনের এই নীতিটি ১৪০০ বছর আগেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন-১৮: শাস্তি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টিকারী সন্দেহের প্রকারভেদগুলো (আশুবহা) কী কী, এবং কোন সন্দেহ গ্রহণযোগ্য হয় না?

بين أنواع الشبهة التي تعتبر مانعا من إقامة الحد، وما هي الشبهة التي لا
(يعتد بها؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

হানাফী মাযহাবের ফিকহবিদগণ, বিশেষ করে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) সন্দেহ বা ‘শুবহাহ’-কে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন। সব ধরনের সন্দেহ শাস্তি মওকুফ করে না, কেবল শরিয়ত স্বীকৃত সন্দেহগুলোই বিবেচ্য।

সন্দেহের প্রকারভেদ (أنواع الشبهة):

১. শুবহাতুল মহাল বা শুবহাতুল মিলক (شبهة المحل / الملك):

অপরাধ সংঘটনের বস্তুতে বা স্থানে মালিকানার সন্দেহ থাকা। অর্থাৎ, অপরাধী যেই মালের ওপর অপরাধ করেছে, তাতে তার নিজেরও কোনো না কোনোভাবে অধিকার আছে বলে দলিল রয়েছে।

- **হুকুম:** এই সন্দেহে হুদুদ রহিত হয়ে যায় এবং তা সর্বসম্মত।

২. শুবহাতুল ফি'ল বা শুবহাতু ইশতিবাহ (الشبهة الفعل / الاشتباه):

কাজের ক্ষেত্রে সন্দেহ। অর্থাৎ, কাজটি প্রকৃতপক্ষে হারাম, কিন্তু অপরাধীর কাছে কোনো প্রমাণের কারণে তা হালাল মনে হয়েছে।

- **হুকুম:** এতেও হুদুদ রহিত হয়। যেমন: সাক্ষী ছাড়া বিয়ে করে স্ত্রী মিলন করা (যদিও বিয়েটি ফাসিদ, কিন্তু অপরাধী একে বৈধ মনে করেছে)।

৩. শুবহাতুল আকদ (شبهة العقد):

চুক্তির সন্দেহ। যেখানে এমন একটি চুক্তি বা আকদ পাওয়া যায় যা শরিয়তে বিতর্কিত বা বাতিল, কিন্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে চুক্তির মতো।

- **হুকুম:** ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে এতে হুদুদ রহিত হয়।

الشبهة التي لا يعتد بها):

যে সন্দেহের কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই, কেবল মনের খেয়াল বা বাতিল ধারণা, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

- **উদাহরণ:** কেউ যদি মদ পান করে দাবি করে যে, "আমি জানতাম না মদ হারাম", অথচ সে দারুল ইসলামে (মুসলিম রাষ্ট্রে) বসবাস করে, তবে তার এই অজ্ঞতার সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মুসলিম দেশে হালাল-হারাম জানা সবার দায়িত্ব।

উপসংহার (خاتمة):

কেবলমাত্র প্রবল এবং শরয়ী দলিলভিত্তিক সন্দেহ হুদুদ রহিত করে। কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন অজুহাত শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারে না।

প্রশ্ন-১৯: “আল হুদুদু তুদরাউ বিশ শুবহাত” এই কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন চুরি বা ব্যভিচারে মালিকানার সন্দেহ।
(أذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: شبهة)
(المك في السرقة أو الزنا)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘সন্দেহের কারণে হুদুদ মাফ হয়’—এই কায়দাটি চুরির শাস্তি (হাত কাটা) এবং জিনার শাস্তি (রজম বা বেত্রাঘাত) থেকে অনেক আসামিকে রক্ষা করে। ‘আল-আশবাহ’ গ্রন্থে বর্ণিত তিনটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ নিচে আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. পিতার চুরি এবং মালিকানার সন্দেহ (السرقة من مال الولد):

যদি কোনো পিতা তার ছেলের সম্পদ চুরি করে, তবে পিতার হাত কাটা যাবে না (হদ জারি হবে না)।

- **কারণ:** এখানে ‘শুবহাতু মিলক’ বা মালিকানার সন্দেহ বিদ্যমান। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: “তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার।” এই হাদিসের ভিত্তিতে পিতার অধিকার ছেলের সম্পদে আছে বলে গণ্য হয়, তাই একে পূর্ণাঙ্গ চুরি বলা যায় না।

২. সরকারি কোষাগার থেকে চুরি (السرقة من بيت المال):

যদি কোনো ব্যক্তি বায়তুল মাল বা সরকারি কোষাগার থেকে সম্পদ চুরি করে, তবে তার হাত কাটা যাবে না।

- **কারণ:** বায়তুল মালের সম্পদ সকল জনগণের (পাবলিক প্রপার্টি)। চোর নিজেও জনগণের একজন, তাই ওই সম্পদে তারও একটি ক্ষুদ্র অংশীদারিত্ব আছে। এই ‘অংশীদারিত্বের সন্দেহ’ (শুবহাতু শিরকাহ)-এর কারণে হুদুদ রহিত হয়ে যাবে, তবে তাকে তা’যির বা অন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

৩. চুক্তির সন্দেহে জিনা (الوطء في النكاح الفاسد):

সাক্ষী ছাড়া বিবাহ বা বোনের ইদ্দত পালনকালে ভুলক্রমে বিয়ে করে সহবাস করা ।

- **কারণ:** এটি প্রকৃতপক্ষে জিনা, কিন্তু যেহেতু একটি ‘বিবাহ চুক্তি’ (যদিও তা বাতিল বা ফাসিদ) সেখানে বিদ্যমান ছিল, তাই একে ‘শুবহাতুল আকদ’ বা চুক্তির সন্দেহ ধরা হয় । ফলে ব্যভিচারের হদ বা রজম শাস্তি দেওয়া হবে না, তবে বংশ পরিচয় (নসব) সাব্যস্ত হবে এবং মোহর দিতে হবে ।

উপসংহার (خاتمة):

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, শরিয়ত কেবল অপরাধ দমন করতে চায় না, বরং অপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কত অবলম্বন করে । যেখানেই আসামির পক্ষে কোনো যুক্তি বা মালিকানার লেশমাত্র পাওয়া যায়, সেখানেই কঠোর শাস্তি শিথিল করা হয় ।

القاعدة السابعة : الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب، ولو صبيا

সপ্তম কায়দা: স্বাধীন মানুষ কারো মালিকানা বা জবরদখলের অধীনে প্রবেশ করে না

প্রশ্ন-২০: “আল হুররু লা ইয়াদখুলু তাহতাল ইয়াদি ফালা ইউদমানু বিল গাসবি...”

কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী?

اشرح مدلول قاعدة : "الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب..."، وما (هو مستندها الأصلي في الشريعة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরিয়ত মানবসত্তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছে। মানুষকে পণ্যের মতো বেচা-কেনা বা জবরদখল করার বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয় না। এই দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ফিকহ শাস্ত্রে সপ্তম মূলনীতিটি প্রতিষ্ঠিত: ‘আল হুররু লা ইয়াদখুলু তাহতাল ইয়াদি ফালা ইউদমানু বিল গাসবি, ওয়া লাও সাবিইয়্যান’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- আল-হুররু (الْحُرُّ): স্বাধীন ব্যক্তি (ক্রীতদাস নয়)।
- লা ইয়াদখুলু তাহতাল ইয়াদি (لا يدخل تحت اليد): কারো হাত বা কর্তৃত্বের অধীনে প্রবেশ করে না (মালিকানাভুক্ত হয় না)।
- ফালা ইউদমানু (فلا يضمن): তাই তার কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।
- বিল গাসবি (بالغصب): জবরদখল বা ছিনতাইয়ের মাধ্যমে।

মর্মার্থ: একজন স্বাধীন মানুষ (সে প্রাপ্তবয়স্ক হোক বা শিশু) কোনো সম্পদ (Mal) নয়। তাই কেউ যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে অপহরণ বা জবরদখল (Ghasb) করে আটকে রাখে এবং ওই অবস্থায় সে মারা যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে জবরদখলকারীকে ওই ব্যক্তির ‘মূল্য’ বা ক্ষতিপূরণ (Daman) দিতে হবে না। কারণ, স্বাধীন মানুষের কোনো আর্থিক মূল্য (Price) নেই, সে অমূল্য। (তবে

হত্যার অপরাধে কিসাস বা দিয়াত ওয়াজিব হতে পারে, যা ফৌজদারি বিধির অন্তর্ভুক্ত)।

শরয়ী দলিল ও মূলভিত্তি (المستند الأصلي):

১. কুরআনুল কারীম: আল্লাহ তাআলা মানুষকে সম্মানিত করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।” (সূরা ইসরা: ৭০)

যাকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, তাকে অন্যের হাতের দখলভুক্ত (Mamluk) বা পণ্যের মতো মনে করা মর্যাদাহানিকর।

২. ফিকহি মূলনীতি (الأصل الفقهي):

الْأَدَمِيُّ مَالِكٌ لَا مَمْلُوكٌ

অর্থ: “মানুষ হলো মালিক, সে মালিকানাধীন বস্তু নয়।”

গাসব বা জবরদখল কেবল সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেহেতু মানুষ সম্পদ নয়, তাই তার ওপর গাসবের বিধান কার্যকর হয় না।

উপসংহার (خاتمة):

স্বাধীন মানুষ পণ্যের উর্ধ্বে। তাই তাকে আটকে রাখলে যদি সে স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে অপহরণকারীর ওপর সম্পদের মতো ক্ষতিপূরণ (যেমন: ছাগল মরে গেলে দাম দেওয়া) ওয়াজিব হয় না। এটি মানুষের মর্যাদার পরিচায়ক।

প্রশ্ন-২১: হানাফী ফিকহে ক্ষতিপূরণের বিধানের দিক থেকে জবরদখলকৃত বস্তু (সম্পদ) এবং জবরদখলকৃত স্বাধীন ব্যক্তি (ব্যক্তি)-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।

بين الفرق الجوهرية بين العين المغصوبة (المال) والحر المغصوب (الشخص) من حيث حكم الضمان في الفقه الحنفي

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

গাসব বা জবরদখলের বিধানে হানাফী ফিকহে ‘মাল’ (সম্পদ) এবং ‘নফস’ (জীবন/ব্যক্তি)-এর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এই পার্থক্যটি মূলত ‘দামান’ বা ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে।

পার্থক্য (الفرق):

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে জবরদখলকৃত সম্পদ এবং স্বাধীন ব্যক্তির পার্থক্য দেখানো হলো:

বিষয়	জবরদখলকৃত সম্পদ (العین المخصوصة)	জবরদখলকৃত স্বাধীন ব্যক্তি (الحر المخصوص)
মূল সত্তা	এটি মানুষের ব্যবহারযোগ্য ও বিনিময়যোগ্য বস্তু (Mal Mutaqawwim)।	এটি সম্মানিত সত্তা (Mukarram), কোনো বিনিময়যোগ্য সম্পদ নয়।
গাসবের বিধান	গাসব বা জবরদখল কার্যকর হয় এবং গাসিব (দখলকারী) জিদ্দাদার হয়।	শরিয়তের দৃষ্টিতে এর ওপর গাসব কার্যকর হয় না (কারণ সে হাতের অধীনে আসে না)।
ক্ষতিপূরণ (Daman)	যদি দখলকারীর কাছে নষ্ট হয় বা হারিয়ে যায়, তবে তার সমপরিমাণ মূল্য বা বস্তু ফেরত দেওয়া ওয়াজিব।	যদি দখলকারীর কাছে আটকে থাকা অবস্থায় স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তবে কোনো ক্ষতিপূরণ (Daman) নেই।
উদাহরণ	কারো মোবাইল ছিনতাই করার পর তা ভেঙে গেলে নতুন মোবাইল বা টাকা দিতে হবে।	কাউকে আটকে রাখার পর সে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলে অপহরণকারীর ওপর কোনো আর্থিক জরিমানা (Daman) নেই (তবে পাপ হবে)।

বিশ্লেষণ:

সম্পদ ধ্বংস হলে তার বিনিময় মূল্য দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব। কিন্তু একজন স্বাধীন মানুষের জীবনের বিনিময় কোনো টাকা দিয়ে হয় না (দিয়াত বা রক্তপণ ভিন্ন বিষয়, যা হত্যার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে গাসবের ক্ষতিপূরণ

নিয়ে)। হানাফী মতে, “স্বাধীন মানুষের কোনো মূল্য নেই যে তা দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যাবে।”

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, মৌলিক পার্থক্য হলো—সম্পদের ক্ষেত্রে দখল করলেই দায়িত্ব (Risk/Liability) বর্তায়, কিন্তু স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কেবল দখল করলেই আর্থিক দায় বা রিস্ক বর্তায় না, যতক্ষণ না তাকে হত্যা করা হয়।

প্রশ্ন-২২: স্বাধীন ব্যক্তিকে জবরদখলের ফলে আর্থিক ক্ষতি (যেমন: মুনাফা হারানো) হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের বিষয়টি আলোচনা কর, এবং এটি কি কায়দাটির ব্যতিক্রম?
ناقش مسألة الضمان المالي في حال ترتب ضرر مالي على غصب الحر (كفوات منفعة)، وهل هذا استثناء من القاعدة؟

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

যদি কোনো স্বাধীন পেশাজীবী ব্যক্তিকে কেউ অন্যায়ভাবে আটকে রাখে, তবে ওই ব্যক্তির উপার্জনের সময় নষ্ট হয়। ফিকহি পরিভাষায় একে বলা হয় ‘ফাওয়াতুল মানফা’আ’ (উপকারিতা বা কর্মঘণ্টা নষ্ট হওয়া)। প্রশ্ন হলো, এই নষ্ট হওয়া সময়ের জন্য কি ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাবে?

মূল আলোচনা (المناقشة):

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী, ‘মানফা’আ’ (উপকারিতা/সেবা) নিজে কোনো সম্পদ (Mal) নয়, যতক্ষণ না তা চুক্তির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় (যেমন: ইজারা)।

১. সাধারণ হুকুম:

যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে আটকে রাখা হয় এবং তাকে দিয়ে কোনো কাজ না করানো হয় (সে অলস বসে থাকে), তবে হানাফী মতে ওই সময়ের জন্য কোনো মজুরি বা ক্ষতিপূরণ দখলকারীর ওপর ওয়াজিব নয়।

- **যুক্তি:** সময় বা কর্মক্ষমতা (Manfa'at) এমন একটি বিষয় যা সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। এটি সংরক্ষণ করা যায় না। আর যা 'মাল' বা সম্পদ নয়, তা নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ (Daman) দিতে হয় না।

২. ব্যতিক্রম বা কাজ করানোর ক্ষেত্রে:

যদি জবরদখলকারী ওই ব্যক্তিকে দিয়ে জোরপূর্বক কাজ করিয়ে নেয়, তবে ফতোয়া অনুযায়ী তাকে 'উজরাতুল মিসল' (বাজার দরে পারিশ্রমিক) দিতে হবে। এটি কায়দার সরাসরি ব্যতিক্রম নয়, বরং এটি 'সেবা গ্রহণ'-এর বিনিময়।

৩. ব্যতিক্রম হিসেবে ইমামদের মতভেদ:

পরবর্তী যুগের কিছু ফিকহবিদ এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, আটকে রাখার কারণে যে আর্থিক ক্ষতি (উপার্জন হারানো) হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বিশেষ করে এতিমের সম্পদ বা ওয়াকফ সম্পত্তির ক্ষেত্রে হানাফী ফিকহেও 'মানফা'আ'-এর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান রয়েছে।

এটি কি কায়দার ব্যতিক্রম? (هل هذا استثناء?):

না, এটি মূল কায়দার (স্বাধীন ব্যক্তি দখলে আসে না) সরাসরি ব্যতিক্রম নয়। বরং এটি 'মানফা'আ' বা উপকারিতা মাল কি না—সেই তাত্ত্বিক বিতর্কের ফল।

- মূল কায়দাটি **সত্তার (Body/Person)** ব্যাপারে প্রযোজ্য (ব্যক্তি মারা গেলে দাম নেই)।
- আর এই প্রশ্নটি **সেবার (Service/Utility)** ব্যাপারে। হানাফী মতে, সেবার ক্ষতিপূরণ নেই, তাই এটি কায়দার সাথে সাংঘর্ষিক নয় বরং কায়দারই সমর্থনকারী।

উপসংহার (خاتمة):

সারকথা হলো, হানাফী ফিকহে স্বাধীন ব্যক্তিকে আটকে রেখে তার সময় নষ্ট করলে সাধারণত কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না, যা আধুনিক আইনের দৃষ্টিতে কঠোর মনে হতে পারে। তবে কাজ করিয়ে নিলে পারিশ্রমিক দিতে হবে।

القاعدة الثامنة : إذا اجتمع أمران من جنس واحد، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً
(অষ্টম কায়দা: ‘তাদাকুল’ বা দুটি বিষয় একত্রিত হওয়া সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-২৩: “ইজা ইজতামাআ আমরানি মিন জিনসিন ওয়াহিদ...” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি (ইবাদতে নাকি মুয়ামালাতে)?
اشرح مدلول قاعدة: "إذا اجتمع أمران من جنس واحد...", وما هو مجال (تطبيقها الرئيسي) (في العبادات أو المعاملات)?

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহ শাস্ত্রের একটি সূক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ কায়দা হলো ‘তাদাকুল’ বা একিভূতকরণ। যখন একই ধরনের দুটি বিধান বা হুকুম একত্রিত হয়, তখন একটির আমল দ্বারা অন্যটি আদায় হবে কি না—তা এই কায়দার মাধ্যমে নির্ধারিত হয় ২।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ:

- ইজতামাআ (اجتمع): একত্রিত হওয়া।
- আমরানি (أمران): দুটি বিষয় বা হুকুম।
- মিন জিনসিন ওয়াহিদ (من جنس واحد): একই প্রকার বা জিনের অন্তর্ভুক্ত।
- লাম ইয়াখতালিফ মাকসুদুহুমা (لم يختلف مقصودهما): তাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন নয়।

মর্মার্থ (المدلول):

যখন একই প্রকারের দুটি বিষয় বা কারণ একত্রিত হয় এবং উভয়ের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন থাকে, তখন সাধারণত একটি অপরাটির মধ্যে প্রবেশ করে (একে ‘তাদাকুল’ বলে)। অর্থাৎ, একটি পালন করলেই উভয়টি আদায় হয়ে যায়, দুটির জন্য পৃথক আমল বা কাজ করার প্রয়োজন হয় না।

প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র (مجال التطبيق الرئيسي):

এই কায়দাটির প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হলো ইবাদত (العبادات) এবং দণ্ডবিধি (الحدود)।

- অধিকাংশ উসূলবিদের মতে, ‘মুয়ামালাত’ বা মানুষের পারস্পরিক লেনদেনে এই কায়দা কম প্রযোজ্য হয়, কারণ বান্দার হক (হুকুকুল ইবাদ) সাধারণত একে অপরের মধ্যে বিলীন হয় না, বরং প্রতিটি অধিকার পৃথকভাবে আদায় করতে হয়।

উপসংহার (خاتمة):

সহজ কথায়, আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে ছাড় বা একত্রীকরণ চলে, কিন্তু বান্দার হকের ক্ষেত্রে প্রতিটি পাওনা আলাদাভাবে পরিশোধ করা মূলনীতি।

প্রশ্ন-২৪: “ইজা ইজতামাআ আমরানি মিন জিনসিন ওয়াহিদ...” প্রয়োগের শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, বিশেষত “একই প্রকার” এবং “উদ্দেশ্যের ভিন্নতা না থাকা” এর ক্ষেত্রে।

بين شروط انطباق هذه القاعدة، خاصة فيما يتعلق بـ "جنس واحد" و"عدم (اختلاف المقصود)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

দুটি আমলকে একিভূত (তাদাকুল) করার জন্য আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) ও ফকিহগণ কিছু কঠোর শর্ত আরোপ করেছেন। সব ক্ষেত্রে একটি কাজ দিয়ে দুই উদ্দেশ্য হাসিল করা যায় না।

শর্তাবলি (الشروط):

১. একই প্রকার বা জিনস হওয়া (أن يكونا من جنس واحد):

দুটি বিষয় অবশ্যই একই প্রকৃতির হতে হবে।

- উদাহরণ: দুটি ওজু বা দুটি গোসল একই প্রকারের। কিন্তু ওজু এবং নামাজ ভিন্ন প্রকারের। তাই ওজু করলে নামাজ আদায় হবে না।

২. উদ্দেশ্যের ভিন্নতা না থাকা (عدم اختلاف المقصود):

দুটি কাজের উদ্দেশ্য হুবহু এক হতে হবে।

- **উদাহরণ:** অপবিত্রতা দূর করা। যদি কারো ওপর জানাবাতের (সহবাসজনিত) গোসল ফরজ হয় এবং একই সাথে হায়েজ (ঋতুশ্রাব) শেষ হওয়ার গোসল ফরজ হয়, তবে উভয়ের উদ্দেশ্য এক—‘পবিত্রতা অর্জন’। তাই এক গোসলেই উভয়টি আদায় হবে।

৩. বান্দার হক না হওয়া (عدم كونه من حقوق العباد):

যদি বিষয়টি মানুষের অধিকার বা আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত হয়, তবে সাধারণত তাদাকুল হয় না। কারণ মানুষের অধিকারের ভিত্তি হলো ‘মুমাকাসা’ বা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করা।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, প্রকার ও উদ্দেশ্য এক হলেই কেবল ছোট আমলটি বড় আমলের পেটে ঢুকে যায় বা একটি দ্বারা অন্যটি আদায় হয়।

প্রশ্ন-২৫: লেনদেনের (যেমন : বিক্রয় ও ইজারা) ক্ষেত্রে এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة في باب (المعاملات كالبيع والإجارة)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও এই কায়দাটি ইবাদতের ক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য, তবুও মুয়ামালাত বা লেনদেনের কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে এর চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায়। বিশেষ করে যখন মালিকানা বা অধিকারের ধরন পরিবর্তিত হয়।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. ইজারা বিক্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করা (دخول الإجارة في البيع):

কোনো ব্যক্তি একটি বাড়ি ভাড়া নিল (ইজারা)। ভাড়ার মেয়াদের মধ্যেই সে বাড়ির মালিকের কাছ থেকে বাড়িটি কিনে ফেলল (বাই)।

- **হুকুম:** এক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তিটি (ইজারা) বিক্রয় চুক্তির (বাই) মধ্যে বিলীন বা প্রবেশ করবে। কারণ মালিকানা (Milkiyyah) ভাড়ার চেয়ে শক্তিশালী। ফ্রোতা এখন নিজের বাড়ির নিজেই মালিক, তাই নিজেকে ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি ‘তাদাকুল’-এর উদাহরণ।

২. জামান বা গ্যারান্টি একিভূত হওয়া (تداخل الضمانات):

কোনো ব্যক্তি একটি বস্তু ছিনতাই করল (গাসব)। এরপর সে ওই বস্তুটি তার কাছে আমানত হিসেবে রাখার দাবি করল বা অন্য কোনো কারণে তার জিম্মায় এল।

- **হুকুম:** এখানে ‘দামান’ বা ক্ষতিপূরণের একাধিক কারণ জমা হলেও ক্ষতিপূরণ একবারই দিতে হবে। একাধিক কারণ (সবব) একই উদ্দেশ্যে (ক্ষতিপূরণ) জমা হয়েছে।

৩. বন্ধক বিক্রয়ের মধ্যে প্রবেশ করা (دخول الرهن في البيع):

ঋণদাতা (মহাজন) ঋণগ্রহীতার কোনো বস্তু বন্ধক (Rahn) রেখেছিল। পরে ঋণদাতা সেই বস্তুটি ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে কিনে নিল।

- **হুকুম:** এখানে বন্ধকী চুক্তিটি বিক্রয় চুক্তির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। কারণ এখন সে নিজেই মালিক, তাই নিজের মাল নিজের কাছে বন্ধক রাখার কোনো অর্থ হয় না।

উপসংহার (خاتمة):

মুয়ামালাতে যখন শক্তিশালী অধিকার (যেমন: মালিকানা) দুর্বল অধিকারের (যেমন: ভাড়া বা বন্ধক) সাথে মিলিত হয়, তখন দুর্বলটি শক্তিশালীটির মধ্যে প্রবেশ করে।

প্রশ্ন-২৬: এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং প্রকারের মিল থাকা সত্ত্বেও কখন দুটি বিষয়ের একটি অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে না?

ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى لا يدخل أحد الأمرين في (الآخر رغم اتفاق الجنس؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

কায়দার সাধারণ নিয়ম হলো, একই জাতীয় দুটি বিষয় একত্রিত হলে একটি অন্যটির অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এর কিছু উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম (ইস্তিসনা) রয়েছে, যেখানে বিষয় দুটি একই প্রকারের হওয়া সত্ত্বেও আলাদা আলাদাভাবে আদায় করতে হয়।

ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রসমূহ (الاستثناءات):

১. কাযা নামাজ বা রোজা (قضاء الصلوات):

কারো যদি জোহরের ৫টি নামাজ কাজা থাকে, তবে সে এক ওয়াক্ত জোহরের নামাজ পড়ে ৫ দিনের জোহরের নিয়ত করতে পারবে না।

- **কারণ:** যদিও সব নামাজ ‘একই প্রকার’ (জিনস ওয়াহিদ) এবং উদ্দেশ্যও এক (আল্লাহর ইবাদত), কিন্তু প্রতিটি নামাজের ‘সময়’ ভিন্ন। সময়ের ভিন্নতার কারণে প্রতিটি আমল স্বতন্ত্র হিসেবে গণ্য হয়।

২. বান্দার আর্থিক অধিকার (الديون المالية):

কারো কাছে যদি আজ ১০০ টাকা ঋণ থাকে এবং পরের দিন আবার ১০০ টাকা ঋণ করা হয়।

- **কারণ:** উভয় ঋণ টাকার অংকে একই প্রকার (জিনস), কিন্তু প্রথম ১০০ টাকা শোধ করলে দ্বিতীয় ১০০ টাকা মাফ হবে না। কারণ বান্দার হকের ক্ষেত্রে ‘তাদাকুল’ বা একত্রীকরণ চলে না।

৩. হদ বা শাস্তির ভিন্নতা:

যদি কেউ চুরি করে (হাত কাটার শাস্তি) এবং ব্যভিচার করে (বেত্রাঘাত বা রজম)। দুটিই হুদুদ (একই প্রকার), কিন্তু তাদাকুল হবে না।

- **কারণ:** এখানে উদ্দেশ্য ভিন্ন এবং অপরাধের ধরন ভিন্ন। তাই চুরির জন্য হাত কাটা হবে এবং জিনার শাস্তিও আলাদাভাবে কার্যকর হবে (যদি না মৃত্যুদণ্ড সবগুলোকে গ্রাস করে)।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, যেখানে ‘সময়’ বা ‘স্বতন্ত্র অধিকার’ জড়িত থাকে, সেখানে প্রকার এক হওয়া সত্ত্বেও একটি আমল অন্যটির মধ্যে প্রবেশ করে না।

القاعدة التاسعة : إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن، فإن لم يمكن أهمل
(নবম কায়দা: ‘কথা কার্যকর করা’ বা ই‘মালুল কালাম সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-২৭: “ই‘মালুল কালামি আওলা মিন ইহমালিহি...” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং উক্তি ও আচরণের ফিকহে এর প্রজ্ঞা কী?

اشرح مدلول قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله.." وما هي حکمتها في (فقه الأقوال والتصرفات؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও শক্তিশালী মূলনীতি হলো ‘ই‘মালুল কালামি আওলা মিন ইহমালিহি’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাটিকে মানুষের কথা ও চুক্তির যথার্থতা রক্ষার মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন। একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের কথা অনর্থক হতে পারে না—এই বিশ্বাসের ওপর কায়দাটি প্রতিষ্ঠিত।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- ই‘মাল (إعمال): কার্যকর করা, আমলে নেওয়া বা অর্থবোধক করা।
- কালাম (الكلام): মানুষের উক্তি বা বাক্য।
- আওলা (أولى): অধিক উত্তম বা শ্রেয়।
- ইহমাল (إهمال): অবহেলা করা, বাতিল করা বা অর্থহীন মনে করা।

মর্মার্থ (المدلول):

যদি কোনো ব্যক্তির কথার দুটি দিক থাকে—একটি দিক গ্রহণ করলে কথাটি অর্থহীন (Lagw) হয়ে যায়, আর অন্য দিকটি গ্রহণ করলে কথাটি কার্যকর ও অর্থবোধক হয়; তবে শরিয়তের নির্দেশ হলো কথাটিকে কার্যকর করতে হবে। অর্থাৎ, বক্তার কথাকে বাতিল বা প্রলাপ মনে না করে, তার কোনো না কোনো শরিয়তসম্মত ব্যাখ্যা বা মর্ম বের করা ওয়াজিব, যাতে কথাটি ‘আমলযোগ্য’ হয়।

শরয়ী প্রজ্ঞা বা হিকমত (الحكمة التشريعية):

উক্তি ও আচরণের ফিকহে এই কায়দার প্রজ্ঞা হলো:

১. মানুষের সম্মানের সুরক্ষা: জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ (আকিল) সাধারণত অনর্থক কথা বলে না। তার কথাকে বাতিল করা মানে তাকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করা। শরিয়ত মানুষকে সম্মান দেয়, তাই তার কথার গুরুত্ব দেয়।

২. চুক্তির পবিত্রতা রক্ষা: যদি মানুষের কথা সহজে বাতিল করা যেত, তবে লেনদেন, বিবাহ, তালাক ও ওয়াকফের মতো গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিগুলো হুমকির মুখে পড়ত। এই কায়দা আইনি স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।

উপসংহার (خاتمة):

সহজ কথায়, কোনো কথার যদি হাকিকি (আক্ষরিক) অর্থ নেওয়া সম্ভব না হয়, তবে মাজাযি (রূপক) অর্থ নিয়ে হলেও কথাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বা কার্যকর করতে হবে।

প্রশ্ন-২৮: কথা কার্যকর করার শর্তাবলি সুস্পষ্ট কর, এবং সম্ভাবনার সীমা কী, যা অতিক্রম করলে কথা অবহেলিত হয়?

(بين شروط إعمال الكلام وما هو حد الإمكان الذي متى تجاوز تعذر إعمال الكلام)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সব কথা সব সময় কার্যকর করা যায় না। ‘ই‘মালুল কালাম’ বা কথা কার্যকর করার জন্য আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও সীমা (Limit) নির্ধারণ করেছেন। যখন এই সীমা অতিক্রম করে, তখন বাধ্য হয়ে কথাকে বাতিল (ইহমাল) করতে হয়।

কথা কার্যকর করার শর্তাবলি (شروط الإعمال):

১. অর্থবহনের যোগ্যতা: শব্দটি বা বাক্যটি আভিধানিক বা পারিভাষিকভাবে কাক্ষিত অর্থবহনের যোগ্যতা রাখতে হবে।

২. শরিয়ত বা যুক্তির বিরোধী না হওয়া: কথাটি এমন হতে পারবে না যা নিশ্চিতভাবে শরিয়ত বা সুস্থ বিবেকের (আকল) পরিপন্থী।

৩. বক্তার যোগ্যতা: বক্তা অবশ্যই সুস্থ মস্তিষ্কের ও প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে (পাগল বা শিশুর কথা কার্যকর হয় না)।

সম্ভাবনার সীমা ও ইহমাল (حد الإمكان والإهمال):

কথা কার্যকর করা ততক্ষণ পর্যন্ত ‘আওলা’ বা উত্তম, যতক্ষণ পর্যন্ত তা ‘সম্ভব’ (মুমকিন) হয়।

- **যখন বাতিল করা হয়:** যদি কোনো কথার হাকিকি (আক্ষরিক) অর্থ নেওয়া অসম্ভব হয় এবং তার কোনো মাজাযি (রূপক) অর্থও খুঁজে পাওয়া না যায়, তখন নিরুপায় হয়ে কথাটিকে ‘ইহমাল’ বা বাতিল করা হয়।

উদাহরণ:

কেউ বলল, "আমি এই গ্লাসের পানি খাব না।"

- **ক্ষেত্র-১ (কার্যকর):** সে গ্লাসের পানি খেল না, কিন্তু অন্য পাত্রে ঢেলে খেল। এখানে শপথ ভঙ্গ হবে না (কথা কার্যকর হয়েছে)।
- **ক্ষেত্র-২ (বাতিল):** কেউ এমন কোনো কাজ করার কসম খেল যা বাস্তবে অসম্ভব (যেমন: আমি আকাশ স্পর্শ করব)। এখানে কথাটি কার্যকর করার কোনো উপায় নেই, তাই এটি বাতিল বা ‘লগব’ হিসেবে গণ্য হবে।

উসূল:

"إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ"

অর্থ: “যখন আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ অসম্ভব হয়, তখন রূপক অর্থের দিকে যাওয়া হয়।” (যদি রূপকও না থাকে, তবেই কেবল কথা বাতিল হয়)।

উপসংহার (خاتمة):

সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে কথার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর। যখন সকল পথ বন্ধ হয়ে যায়, কেবল তখনই কথাকে অর্থহীন ঘোষণা করা বৈধ।

প্রশ্ন-২৯: শপথ এবং তালাকের ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, বিশেষত যখন শব্দে দ্বিধা বা স্ববিরোধিতা থাকে, তখন তা কীভাবে প্রযোজ্য হয় ব্যাখ্যা কর।
(وضع كيف تطبق هذه القاعدة في باب الأيمان والطلاق، خاصة عند وجود (التردد أو التناقض في اللفظ)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

শপথ (Yamin) এবং তালাক (Talaq)—এই দুটি স্পর্শকাতর অধ্যায়ে ‘ই‘মালুল কালাম’ কায়দাটির ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে সামান্য অস্পষ্টতা বা রূপক শব্দকেও কার্যকর করে আইনি বিধান দেওয়া হয়।

শপথের ক্ষেত্রে প্রয়োগ (في الأيمان):

শপথের বাক্যে যদি আক্ষরিক অর্থ অসম্ভব হয়, তবে রূপক অর্থ নিয়ে শপথ কার্যকর করা হয়।

- **উদাহরণ:** কোনো ব্যক্তি শপথ করল, "আমি এই গাছ থেকে খাব না।"
 - **বিশ্লেষণ:** আক্ষরিক অর্থে ‘গাছ খাওয়া’ (কাঠ/পাতা খাওয়া) মানুষের কাজ নয় বা অসম্ভব।
 - **প্রয়োগ:** এখানে কথাটি বাতিল করা হবে না। বরং ‘ই‘মাল’ করে এর রূপক অর্থ নেওয়া হবে—অর্থাৎ "আমি এই গাছের ফল খাব না।" যদি সে ফল খায়, তবেই কসম ভঙ্গ হবে। এখানে বক্তার কথাকে অর্থহীন হওয়া থেকে বাঁচানো হলো।

তালাকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ (في الطلاق):

তালাকের ক্ষেত্রে অস্পষ্ট বা কিনায়া শব্দ ব্যবহার করলে এই কায়দা অনুযায়ী তালাক পতিত হয়, যাতে শব্দটির একটি বিহিত করা যায়।

- **উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, "তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই" বা "তুমি আমার জন্য হারাম।"

- **বিশ্লেষণ:** আক্ষরিক অর্থে সম্পর্ক না থাকা বা হারাম হওয়া (যেমন খাবারের মতো) উদ্দেশ্য নয়।
- **প্রয়োগ:** এখানে কথাটিকে বাতিল না করে এর রূপক অর্থ ‘**তালাক**’ বা বিবাহ বিচ্ছেদ গ্রহণ করা হবে (যদি নিয়ত থাকে)। কারণ, একজন স্বামী তার স্ত্রীকে এমনি এমনি "হারাম" বলে না; তার কথার একটি আইনি প্রভাব থাকা উচিত।

দ্বিধা বা স্ববিরোধিতার ক্ষেত্রে (عند التردد):

যদি শব্দের মধ্যে এমন কোনো স্ববিরোধিতা থাকে যা দূর করা সম্ভব, তবে তা দূর করে কথা কার্যকর করা হবে।

- **উদাহরণ:** কেউ তার স্ত্রীকে বলল, "তোমাকে তালাক, না থাক তালাক নয়।"
- **হুকুম:** এখানে প্রথম অংশ (তোমাকে তালাক) কার্যকর করা হবে, আর দ্বিতীয় অংশ (না থাক...) বাতিল করা হবে। কারণ, তালাক একবার মুখ থেকে বের হলে তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। এখানে "তালাক কার্যকর করা" (ই‘মাল) প্রাধান্য পাবে "বাতিল করা"র চেয়ে।

উপসংহার (خاتمة):

শপথ ও তালাকের ক্ষেত্রে শব্দ চয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ যাতে নিজের কথার দায়বদ্ধতা এড়াতে না পারে এবং শরিয়তের বিধান নিয়ে খেল-তামাশা না করতে পারে, সেজন্য এই কায়দাটি অত্যন্ত প্রহরীর মতো কাজ করে।

القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان

(দশম কায়দা: ‘আল খারাজু বিদ দামান’ বা লাভ-ক্ষতির ঝুঁকি সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৩০: “আল খারাজু বিদ দামান” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং সুন্নাহ থেকে এর মূল দলিল কী?

اشرح مدلول قاعدة: "الخراج بالضمان"، وما هو دليلها الأصلي من السنة (النسبية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি অর্থনীতির ন্যায্যবিচার ও ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম মূলনীতি হলো ‘আল খারাজু বিদ দামান’। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর মতে, মালিকানা ও মুনাফা অর্জনের অধিকার নির্ণয়ে এই কায়দাটি সিদ্ধান্তকারী ভূমিকা পালন করে। লাভ এবং ঝুঁকি একে অপরের পরিপূরক—এটিই এই কায়দার সারকথা।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- **আল-খারাজ (الخراج):** এর আভিধানিক অর্থ ভূমি কর। তবে এখানে অর্থ হলো—আয়, মুনাফা, উপস্বত্ব, বা কোনো বস্তু ব্যবহারের সুবিধা (যেমন: জমির ফসল, পশুর দুধ, বাড়ির ভাড়া)।
- **আদ-দামান (الضمان):** এর অর্থ হলো ঝুঁকি গ্রহণ, ক্ষতিপূরণের দায়ভার বা জিহ্মাদারি।
- **মর্মার্থ (المدلول):** যে ব্যক্তি কোনো বস্তুর ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি (Risk/Liability) বহন করে, সেই বস্তু থেকে অর্জিত মুনাফা বা আয় তার প্রাপ্য। অর্থাৎ, বস্তুটি ধ্বংস হলে যার লোকসান হতো, বস্তুটি টিকে থাকা অবস্থায় তার আয়ও তারই হবে। ঝুঁকি ছাড়া কোনো লাভ নেই।

সুন্নাহ থেকে দলিল (الدليل من السنة):

এই কায়দাটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বিখ্যাত ফয়সালা থেকে উৎসারিত।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত:

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ اسْتَعْلَلْتُ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

অর্থ: “এক ব্যক্তি একটি গোলাম ক্রয় করল এবং কিছুদিন তার কাছে রাখল। এরপর সে গোলামটির মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখতে পেল। বিষয়টি নিয়ে সে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গেলে তিনি গোলামটিকে বিক্রেতার কাছে ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন বিক্রেতা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! সে তো আমার গোলাম দিয়ে কাজ করিয়ে আয় করেছে (সুবিধা ভোগ করেছে)।’ তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন: ‘যে ঝুঁকি বহন করে, লাভ বা আয় তার (আল খারাজু বিদ দামান)।’” [সুনানে আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ]

উপসংহার (خاتمة):

যেহেতু গোলামটি ক্রেতার কাছে থাকাবস্থায় মারা গেলে ক্ষতি ক্রেতার হতো, তাই ওই সময়ের উপার্জিত আয়ও ক্রেতারই প্রাপ্য। বিক্রেতা সেই আয় দাবি করতে পারে না।

প্রশ্ন-৩১: ফিকহি মালিকানায় ফলন (মুনাফা/বৃদ্ধি) এবং ঝুঁকি (ক্ষতি বহন/দায়িত্ব)-এর মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট কর।

بين العلاقة بين الخراج (المنفعة/النماء) والضمان (تحمل) (الخسارة/المسؤولية) في الملكية الفقهية

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহি মালিকানায় ‘অধিকার’ এবং ‘দায়িত্ব’ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। যার কাঁধে দায়িত্ব (Liability) নেই, তার পকেটে লাভের টাকা (Profit) ঢোকার অধিকার নেই।

সম্পর্ক বিশ্লেষণ (العلاقة):

১. পরিপূরক সম্পর্ক (Talaazum): খারাজ (আয়) এবং দামান (ঝুঁকি) একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানেই দামান পাওয়া যাবে, সেখানেই খারাজ থাকবে।

* উদাহরণ: আপনি একটি গাড়ি কিনলেন। গাড়িটি যদি এক্সিডেন্ট করে, মেরামত খরচ আপনার (দামান)। সুতরাং, গাড়িটি ভাড়ায় চালিয়ে যে টাকা আসবে, তা-ও আপনার (খারাজ)।

২. ন্যায়বিচারের সম্পর্ক: ইসলাম বিনা ঝুঁকিতে মুনাফা অর্জনকে নিরুৎসাহিত করে। সুদ (Riba) হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ হলো, সুদে ঋণদাতা কোনো ঝুঁকি বহন করে না, কিন্তু নিশ্চিত মুনাফা চায়। অথচ ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি উভয়ের ঝুঁকি থাকে বলে তা হালাল।

৩. মালিকানার ভিত্তি: বস্তুর মালিকানা প্রমাণ হওয়ার অন্যতম দলিল হলো ঝুঁকি বহন করা। যার মাল নষ্ট হলে যার ক্ষতি, সেই মালের বৃদ্ধি বা লাভ তারই হক।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ফিকহি পরিভাষায়—“লাভ হলো ঝুঁকির পুরস্কার।” ঝুঁকিহীন লাভ শরিয়তে বৈধ নয় (কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)।

প্রশ্ন-৩২: ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয় (বাতিল চুক্তি) এবং ক্ষতিপূরণের (যেমন : জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ) ক্ষেত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা ব্যাখ্যা কর।

وضح كيف تطبق هذه القاعدة في باب البيوع الفاسدة والضمانات (كضمان العين المغصوبة)؟

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

বৈধ ব্যবসার বাইরেও ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি (ফাছিদ) বা জবরদখলের (গাসব) ক্ষেত্রে এই কায়দার জটিল কিন্তু চমৎকার প্রয়োগ রয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন।

ফাসেদ ক্রয়-বিক্রয়ে প্রয়োগ (في البيع الفاسد):

বাইয়ে ফাসেদ বা ত্রুটিপূর্ণ বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা যখন পণ্যটি হস্তগত (Qabd) করে, তখন সে পণ্যটির জিম্মাদার হয়ে যায়।

- **হুকুম:** যেহেতু পণ্যটি ক্রেতার হাতে নষ্ট হলে তাকেই ক্ষতিপূরণ (মূল্য) দিতে হয়, তাই পণ্যটি তার হাতে থাকাকালীন যদি কোনো লাভ হয় (যেমন: কেনা গাভীর দুধ, বা কেনা বাড়ির ভাড়া), তবে সেই লাভ বা ‘খারাজ’ ক্রেতারই হবে। যদিও চুক্তিটি ফাসেদ ছিল এবং পণ্যটি ফেরত দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু অর্জিত মুনাফা ভোগ করার অধিকার তার অর্জিত হয় ‘দামান’ বা ঝুঁকির কারণে।

জবরদখল বা গাসবের ক্ষেত্রে (في الغصب):

গাসব বা জবরদখলকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে হানারফী মাযহাবে সামান্য মতপার্থক্য আছে।

- **সাধারণ নিয়ম:** জবরদখলকারী (Ghasib) বস্তুর জামিন বা জিম্মাদার (যদি নষ্ট হয়, তাকে দাম দিতে হবে)।
- **ব্যতিক্রম:** কিন্তু জবরদখলকৃত বস্তুর আয় (যেমন: অন্যের বাড়ির ভাড়া) জবরদখলকারীর জন্য হালাল নয়। কারণ এখানে ‘খারাজ’ বা লাভটি ‘মালিকানা’র ভিত্তিতে আসেনি, বরং অন্যায়ের ভিত্তিতে এসেছে। তবে যদি সে জরিমানা (Daman) দেয়, তখন পূর্বের সময়ের লাভ তার জন্য বৈধ হতে পারে (কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষে)।
- **মূল কথা:** তবে ‘খারাজু বিদ দামান’ কায়দাটি মূলত চুক্তির ক্ষেত্রে (যেমন: ক্রটিপূর্ণ পণ্য ফেরত দেওয়া) বেশি কার্যকর, জবরদখলের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কিছুটা সীমিত।

উপসংহার (خاتمة):

ফাসেদ চুক্তিতেও যেহেতু দখলের কারণে ঝুঁকি তৈরি হয়, তাই শরিয়ত সেই ঝুঁকির বিপরীতে অর্জিত মুনাফাকে সাময়িকভাবে বৈধতা দেয়।

প্রশ্ন-৩৩: “আল খারাজু বিদ দামান” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন হস্তগত করার আগে ক্রয়কৃত পশুর বাচ্চা।
(أذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: نتاج البهيمة المشتراة قبل القبض)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

দৈনন্দিন লেনদেন ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে এই কায়দাটির অসংখ্য নজির (Furu) রয়েছে। নিচে তিনটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ দেওয়া হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. ক্রটিযুক্ত পণ্য ফেরত দেওয়া (الرد بالعيب):

এক ব্যক্তি একটি গাভী কিনল। তিন দিন পর দেখল গাভীটি অসুস্থ (ক্রটি)। এই তিন দিন সে গাভীর দুধ দোহন করে খেয়েছে।

- **হুকুম:** সে গাভীটি ফেরত দেবে এবং পূর্ণ টাকা ফেরত নেবে। কিন্তু তিন দিন যে দুধ খেয়েছে, তার দাম বিক্রেতাকে দিতে হবে না। কারণ, এই তিন দিন গাভীটি মারা গেলে ক্ষতি ক্রেতারই হতো। যেহেতু ঝুঁকি ক্রেতার ছিল, তাই দুধ (খারাজ) ক্রেতারই প্রাপ্য।

২. হস্তগত করার পরে পশুর বাচ্চা (نتاج البهيمة):

ক্রেতা পশু কেনার পর নিজের বাড়িতে নিয়ে এল (হস্তগত করল)। এরপর পশুটি বাচ্চা দিল। পরে মূল পশুতে ক্রটি পাওয়ায় সে তা ফেরত দিতে চাইল।

- **হুকুম:** সে মূল পশুটি ফেরত দেবে, কিন্তু বাচ্চাটি তার কাছেই থাকবে। কারণ বাচ্চাটি তার জিম্মায় বা ঝুঁকিতে থাকাবস্থায় জন্ম হয়েছে। এটি তার ‘খারাজ’। (প্রশ্নে উল্লিখিত “হস্তগত করার আগে” বিষয়টি মূলত বিক্রেতার ঝুঁকির অধীনে থাকে, তাই তখন লাভও বিক্রেতার হয়)।

৩. বাড়ির ভাড়া (أجرة الدار):

কেউ একটি বাড়ি কিনল এবং এক মাস বসবাস করল বা ভাড়া দিল। পরে দলিলে বা বাড়িতে বড় কোনো আইনি ঝামেলা (ত্রুটি) পাওয়ায় সে বাড়িটি ফেরত দিল।

- **হুকুম:** এই এক মাসের ভাড়া বা থাকার সুবিধা ভোগ করার জন্য তাকে কোনো টাকা দিতে হবে না। কারণ এই এক মাস বাড়িটি ধসে পড়লে ক্ষতি তার (ক্রেতার) হতো। তাই এর সুবিধাও তার।

উপসংহার (خاتمة):

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, ইসলামি শরিয়তে অধিকার ও কর্তব্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঝুঁকি যার, লাভ তার—এটিই চূড়ান্ত ফয়সালা।

القاعدة الحادية عشرة : السؤال معاد في الجواب

(একাদশ কায়দা: ‘প্রশ্ন উত্তরে পুনরাবৃত্ত’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৩৪: “আস-সুয়ালা মু‘আদুন ফিল জওয়াব” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শপথ ও স্বীকারোক্তির ফিকহে এর গুরুত্ব কী?

اشرح مدلول قاعدة: "السؤال معاد في الجواب"، وما هي أهميتها في فقه (الأيمان والإقرار)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

বিচারকার্য পরিচালনা এবং দৈনন্দিন কথাবার্তার আইনি মানদণ্ড নির্ধারণে ‘আস-সুয়ালা মু‘আদুন ফিল জওয়াব’ একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী মূলনীতি। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর মতে, সংক্ষিপ্ত উত্তরকে পূর্ণাঙ্গ বাক্যে রূপান্তর করার মাধ্যম হলো এই কায়দা।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- আস-সুয়ালা (السؤال): প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা।
- মু‘আদুন (معاد): পুনরাবৃত্ত, ফিরে আসা বা শামিল থাকা।
- ফিল জওয়াব (في الجواب): উত্তরের মধ্যে।

মর্মার্থ (المدلول):

যখন কাউকে কোনো প্রশ্ন করা হয় এবং সে উত্তরে কেবল ‘হ্যাঁ’ (نعم) বা ‘না’ (لا) অথবা সম্মতিসূচক কোনো শব্দ বলে, তখন মনে করা হবে যে, প্রশ্নের পুরো বাক্যটিই সে তার উত্তরে উচ্চারণ করেছে। অর্থাৎ, প্রশ্নটি উত্তরের মধ্যে হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

শপথ ও স্বীকারোক্তির ফিকহে গুরুত্ব (الأهمية):

১. স্বীকারোক্তি (الإقرار):

বিচারক বা কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে প্রশ্ন করে, “তুমি কি অমুকের কাছে ১০০০ টাকা ঋণী?” আর সে উত্তরে শুধু বলে “হ্যাঁ”।

- **হুকুম:** এই কায়দা অনুযায়ী তার উত্তরটি হবে: “হ্যাঁ, আমি অমুকের কাছে ১০০০ টাকা ঋণী।” ফলে তার ওপর ঋণ সাব্যস্ত হবে। যদি এই কায়দা না থাকত, তবে শুধু ‘হ্যাঁ’ শব্দটি অর্থহীন হতো।

২. শপথ (الأيمان):

কাউকে জিজ্ঞেস করা হলো, “আল্লাহর কসম, তুমি কি এই কাজ করবে না?” সে বলল, “হ্যাঁ”।

- **হুকুম:** এখানে সে যেন বলল, “হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, আমি এই কাজ করব না।” ফলে তার ওপর কসম বা শপথ কার্যকর হবে এবং তা ভাঙলে কাফফারা দিতে হবে।

উপসংহার (خاتمة):

মানুষের সংক্ষিপ্ত সম্মতিকে আইনি রূপ দেওয়ার জন্য এই কায়দাটি অপরিহার্য। এটি প্রমাণ করে যে, উত্তরদাতার ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ কেবল শব্দ নয়, বরং এটি পুরো প্রস্তাবনার স্বীকৃতি।

প্রশ্ন-৩৫: “আস-সুয়ালু মু‘আদুন ফিল জওয়াব” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন ক্রেতার মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা।
(ذكر ثلاثا من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل : سؤال المشتري عن الثمن)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

বিয়ে, তালাক, ক্রয়-বিক্রয় এবং স্বীকারোক্তির ক্ষেত্রে এই কায়দার বহুবিধ প্রয়োগ (Furu) রয়েছে। ‘আল-আশবাহ’ গ্রন্থে অবলম্বনে তিনটি প্রধান উদাহরণ নিচে আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. ক্রেতার মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা (سؤال المشتري عن الثمن):

ক্রোতা বিক্রোতাকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি এই কাপড়টি ১০০ টাকায় বিক্রি করেছ?” বিক্রোতা বলল, “হ্যাঁ”।

- **হুকুম:** এখানে বিক্রি সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ, বিক্রোতার “হ্যাঁ” বলার অর্থ হলো: “হ্যাঁ, আমি ১০০ টাকায় বিক্রি করেছি।” এখানে নতুন করে ‘আমি বিক্রি করলাম’ (Ijab) বলার প্রয়োজন নেই^৩।

২. বিবাহের প্রস্তাব (عقد النكاح):

মজলিসে একজন পুরুষ একজন মহিলাকে (বা তার অভিভাবককে) বলল, “তুমি কি তোমার নিজেকে ১০০০ টাকা মোহরানার বিনিময়ে আমার কাছে বিয়ে দিলে?” মহিলা বলল, “হ্যাঁ”।

- **হুকুম:** বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। কারণ, তার উত্তরের ভেতরে প্রশ্নের বাক্যটি লুকায়িত আছে। অর্থাৎ, “হ্যাঁ, আমি বিয়ে দিলাম।”

৩. তালাক প্রদান (إيقاع الطلاق):

স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি আমাকে তালাক দিয়েছ?” স্বামী বলল, “হ্যাঁ”।

- **হুকুম:** সাথে সাথে তালাক পতিত হবে। কারণ স্বামীর “হ্যাঁ” শব্দটি এখানে পূর্ণাঙ্গ বাক্য (“হ্যাঁ, আমি তোমাকে তালাক দিয়েছি”) হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার (خاتمة):

এই উদাহরণগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, প্রশ্নের প্রেক্ষাপট উত্তরের অংশ হিসেবে গণ্য হয় এবং সে অনুযায়ী শরিয়তের বিধান (হুকুম) আরোপিত হয়।

প্রশ্ন-৩৬: “আস-সুয়ালু মু‘আদুন ফিল জওয়াব” এ কায়দা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা কী? কখন প্রশ্ন উত্তরে পুনরাবৃত্ত বলে গণ্য হয় না?

(ناقش مسألة قيود تطبيق هذه القاعدة؛ متى لا يعد السؤال معاداً في الجواب؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সব উত্তরেই প্রশ্ন পুনরাবৃত্ত হয় না। এই কায়দা প্রয়োগের কিছু নির্দিষ্ট শর্ত ও সীমাবদ্ধতা (Quyud) রয়েছে। যখন উত্তরটি প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না, তখন এই কায়দা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রম (القيود والاستثناءات):

১. উত্তর যদি স্বাধীন বাক্য হয় (إذا كان الجواب كلاماً مبتدأ):

যদি উত্তরদাতা কেবল “হ্যাঁ” বা “না” না বলে সম্পূর্ণ নতুন একটি বাক্য বলে যা প্রশ্নের সাথে সরাসরি মেলে না, তবে প্রশ্নটি উত্তরে পুনরাবৃত্ত হবে না।

- **উদাহরণ:** কেউ জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি জায়েদকে মেরেছ?” সে উত্তর দিল, “আমি আমারকে মেরেছি।”
- **বিশ্লেষণ:** এখানে সে জায়েদকে মারার কথা স্বীকার করেনি। তার উত্তরটি একটি নতুন স্বীকারোক্তি। এখানে প্রশ্নটি উত্তরে শামিল হয়নি।

২. প্রশ্নের বিষয়ের পরিবর্তন (تغيير الموضوع):

যদি উত্তরের মাধ্যমে প্রশ্নের বিষয়বস্তু পরিবর্তন করা হয়।

- **উদাহরণ:** প্রশ্ন করা হলো, “তোমার কাছে কি আমার ১০০০ টাকা আমানত আছে?” সে বলল, “আমার কাছে তোমার ১০০০ টাকা ঋণ আছে।”
- **বিশ্লেষণ:** এখানে আমানতের প্রশ্ন উত্তরে আসেনি, বরং ঋণের নতুন দাবি এসেছে। তাই আমানতের হুকুম এখানে প্রযোজ্য হবে না।

৩. ব্যাকরণগত বা যৌক্তিক অসামঞ্জস্য:

যদি প্রশ্নের ধরন এবং উত্তরের ধরনের মধ্যে মিল না থাকে, তবে প্রশ্নটি উত্তরের অংশ হবে না। উত্তরদাতার নিয়ত বা স্পষ্ট শব্দই তখন ধর্তব্য হবে।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ‘আস-সুয়ালা মু‘আদুন ফিল জওয়াব’ কায়দাটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন উত্তরটি হবে সংক্ষিপ্ত এবং তা সরাসরি প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত। উত্তরদাতা যদি নতুন কোনো প্রসঙ্গ বা বাক্য শুরু করে, তবে এই কায়দা খাটে না।

القاعدة الثانية عشرة : لا ينسب إلى ساكت قول

(দ্বাদশ কায়দা: ‘নীরবতা সম্মতির লক্ষণ কি না’ বা লা ইউনসাবু ইলা সাকিতিন কাওল সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৩৭: “লা ইউনসাবু ইলা সাকিতিন কাওল” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর, এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী?

اشرح مدلول قاعدة: "لا ينسب إلى ساكت قول"، وما هو مستندها الأصلي (في الشريعة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি আইন বা ফিকহ শাস্ত্রে বাকপটুতা ও স্পষ্টতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। চুক্তিনামা বা লেনদেনের ক্ষেত্রে নীরবতার অবস্থান কী—তা নির্ধারণ করতে ফিকহবিদগণ দ্বাদশ মূলনীতি হিসেবে ‘লা ইউনসাবু ইলা সাকিতিন কাওল’ নির্ধারণ করেছেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর মতে, এটি মানুষের অধিকার রক্ষার একটি মৌলিক নীতি।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- লা ইউনসাবু (لا ينسب): সম্বন্ধ করা যায় না বা আরোপ করা যায় না।
- ইলা সাকিতিন (إلى ساكت): কোনো নীরব বা চুপ থাকা ব্যক্তির দিকে।
- কাওল (قول): কোনো উক্তি, কথা বা মতামত।

মর্মার্থ (المدلول):

যে ব্যক্তি চুপ থাকে, সে কিছুই বলে না। সুতরাং, তার নীরবতাকে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’—কোনোটাই বলা যাবে না। মৌলিকভাবে নীরবতা হলো ‘শূন্যতা’। তাই কারো নীরব থাকার সুযোগ নিয়ে তার নামে কোনো কথা বা সম্মতি চালিয়ে দেওয়া শরিয়তে বৈধ নয়। নীরব ব্যক্তিকে কোনো কথার দায়ভার দেওয়া যায় না।

শরয়ী দলিল ও মূলভিত্তি (المستند الأصلي):

১. ফিকহি মূলনীতি: শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হলো—

"الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ وَالْأَمْوَالِ التَّحْرِيمُ وَالْعِصْمَةُ"

অর্থ: “লজ্জাস্থান ও সম্পদের ক্ষেত্রে মূল হলো হারাম থাকা এবং সংরক্ষিত থাকা।”

কারো সম্পদ বা অধিকার তার স্পষ্ট অনুমতি (কথা) ছাড়া নেওয়া যাবে না। নীরবতা যেহেতু অস্পষ্ট, তাই তা দিয়ে অন্যের অধিকার হরণ করা যায় না।

২. হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أَمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

অর্থ: “নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল-ত্রুটি, বিস্মৃতি এবং যা তাদের ওপর জবরদস্তি করা হয় তা ক্ষমা করেছেন।”

চুপ থাকা ব্যক্তি অনেক সময় ভয়ে বা দ্বিধায় চুপ থাকে, তাই তাকে জোর করে সম্মতির আওতায় আনা যায় না।

উপসংহার (خاتمة):

সূতরাং, নীরবতা মূলত সম্মতির অভাবকেই নির্দেশ করে, যতক্ষণ না বিশেষ কোনো দলিল বা প্রেক্ষাপট পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩৮: এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমগুলো সুস্পষ্ট কর এবং ফিকহে কখন নীরবতা স্বীকারোক্তি বা সম্মতি হিসেবে বিবেচিত হয়?

بين الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة، ومتى يعتبر السكوت بمثابة (إقرار أو رضا في الفقه)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও সাধারণ নিয়ম হলো ‘নীরবতা সম্মতি নয়’, কিন্তু আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে বা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে নীরবতাও কথার মর্যাদা পায়। একে বলা হয়—“আস-সুকুতু ফি মা‘রাদিলে হা-জাতি বায়ান” (প্রয়োজনের মুহূর্তে চুপ থাকাটাই বর্ণনা বা সম্মতি)।

ব্যতিক্রম বা নীরবতা যখন সম্মতি (الاستثناءات):

নীরবতা সম্মতি হিসেবে গণ্য হওয়ার প্রধান ক্ষেত্রগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. কুমারীর বিবাহের সম্মতি (إذن البكر في النكاح):

যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক কুমারী মেয়েকে তার অভিভাবক (বাবা বা দাদা) বিয়ের প্রস্তাব দেয় বা অনুমতি চায়, আর সে চুপ থাকে (হেসে দেয় বা কান্না করে না), তবে এই নীরবতা তার ‘সম্মতি’ হিসেবে গণ্য হবে।

- **দলিল:** হাদিসে এসেছে, “তার নীরবতাই তার সম্মতি।” (সহিহ মুসলিম)

২. ত্রুটি দেখে চুপ থাকা (الرضا بالعيب):

ক্রেতা পণ্য কেনার পর তাতে কোনো ত্রুটি (আইব) দেখল। দেখার পরেও সে সাথে সাথে পণ্যটি ফেরত দিল না বা অভিযোগ করল না, বরং চুপ করে ব্যবহার করতে থাকল।

- **হুকুম:** এই নীরবতা প্রমাণ করে যে, সে ত্রুটিযুক্ত পণ্যেই সন্তুষ্ট। পরে সে আর ফেরত দিতে পারবে না।

৩. শপথের প্রস্তাব (عرض اليمين):

বিচারক যদি বিবাদীকে বলেন, “তুমি শপথ কর যে তুমি ঋণী নও।” আর সে শপথ করতে অস্বীকার করে চুপ থাকে (শপথও করে না, স্বীকারও করে না)।

- **হুকুম:** এই নীরবতাকে ‘নুকুল’ বা অস্বীকৃতি এবং পরোক্ষ স্বীকারোক্তি ধরা হয়। ফলে রায় তার বিরুদ্ধে যাবে।

৪. শুফআ বা অগ্রক্রয় অধিকার (الشفعة):

প্রতিবেশী যদি শোনে যে তার পাশের জমি বিক্রি হচ্ছে, অথচ সে চুপ থাকে এবং দাবি পেশ করে না। এই নীরবতা তার অধিকার ত্যাগের সম্মতি হিসেবে গণ্য হবে।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, যেখানে কথা বলা অপরিহার্য বা প্রতিবাদ করা জরুরি, সেখানে চুপ থাকাটা সম্মতির নামান্তর।

প্রশ্ন-৩৯: নীরবতা এবং উদাসীনতা (বিরত থাকা)-এর মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর এবং উভয়ের উপর আরোপিত ফিকহি বিধান কীভাবে ভিন্ন হয়?

ناقش مسألة الفرق بين السكوت والإعراض، وكيف يختلف الحكم الفقهي (المترتب على كل منهما؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহুল মুয়ামালাতে ‘সুকুত’ (নীরবতা) এবং ‘ই‘রাদ’ (উদাসীনতা বা বিমুখতা) এক বিষয় নয়। দুটির বাহ্যিক রূপ এক মনে হলেও আইনি প্রভাবে বড় পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য ও বিধান (الفرق والحكم):

বিষয়	সুকুত বা নীরবতা (السكوت)	ই‘রাদ বা বিমুখতা (الإعراض)
সংজ্ঞা	কোনো কথা না বলা, কিন্তু মনোযোগ বা উপস্থিতি বজায় রাখা।	কোনো বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া বা স্থান ত্যাগ করা।
মানসিক অবস্থা	চিন্তা-ভাবনা বা সম্মতির সম্ভাবনা থাকে।	প্রত্যাখ্যান বা অনাগ্রহের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসে (Majlis al- Aqd)	যদি বিক্রেতা প্রস্তাব দেয় এবং ক্রেতা কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিন্তা করে, তবে মজলিস যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ কবুল করার অধিকার থাকে।	যদি প্রস্তাবের পর ক্রেতা অন্য কথায় লিপ্ত হয় বা উঠে চলে যায় (ই‘রাদ), তবে প্রস্তাবটি সাথে সাথে বাতিল (বাতিল) হয়ে যায়। পরে কবুল করলে কাজ হবে না।
হুকুম	বিশেষ ক্ষেত্রে (যেমন কুমারীর বিয়ে) এটি সম্মতি।	এটি সর্বাবস্থায় ‘প্রত্যাখ্যান’ (Radd) হিসেবে গণ্য হয়।

বিশ্লেষণ:

- **সুকুত:** এটি একটি নিরপেক্ষ অবস্থা। প্রয়োজনের তাগিদে একে ‘হ্যাঁ’ ধরা হতে পারে।
- **ই‘রাদ:** এটি একটি নেতিবাচক অবস্থা (Negative Action)। এটি সরাসরি ‘না’ বলার মতোই কার্যকর।

উদাহরণ:

বিক্রেতা বলল, “১০০ টাকায় নিবে?” ক্রেতা চুপ করে বসে রইল (সুকুত)—প্রস্তাব বহাল আছে। কিন্তু ক্রেতা যদি উত্তর না দিয়ে পাশের লোকের সাথে রাজনীতির আলাপ শুরু করে (ই‘রাদ)—প্রস্তাব বাতিল।

উপসংহার (خاتمة):

সুকুত বা নীরবতা কখনো কখনো সম্মতির অর্থ বহন করে, কিন্তু ই‘রাদ বা বিমুখতা সর্বদা বাতিলের নামান্তর। ফিকহি মাসআলায় এই সূক্ষ্ম পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

القاعدة الثالثة عشرة : الفرض أفضل من النفل إلا في مسائل

(ত্রয়োদশ কায়দা: ‘ফরজ নফল অপেক্ষা উত্তম’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৪০: “আল-ফারদু আফদালু মিনান নাফলি...” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং কোন মূলনীতির উপর এ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত?

اشرح مدلول قاعدة: "الفرض أفضل من النفل...", وما هو الأصل الذي تقوم (عليه هذه الأفضلية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইবাদতের স্তরের ভিন্নতা বোঝা ফিকহ শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ত্রয়োদশ মূলনীতি ‘আল-ফারদু আফদালু মিনান নাফলি ইল্লা ফি মাসাইল’ (কিছু মাসআলা ছাড়া নফলের চেয়ে ফরজ উত্তম) এই ধারণাটি স্পষ্ট করে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ফরজের মর্যাদা নফলের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- আল-ফারদু (الفرض): যা শরিয়ত অকাট্য দলিলে আবশ্যক করেছে।
- আন-নাফলু (النفل): যা অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক ইবাদত।
- আফদালু (أفضل): অধিক উত্তম বা মর্যাদাপূর্ণ।

তাৎপর্য (المدلول):

শরিয়তের দৃষ্টিতে, নফল ইবাদত যতই বেশি করা হোক না কেন, তা একটি ফরজের সমতুল্য হতে পারে না। ফরজের অবস্থান হলো ‘মূলধন’ (আসল)-এর মতো, আর নফল হলো ‘মুনাফা’ (লাভ)-এর মতো। মূলধন ঠিক না থাকলে মুনাফার কোনো মূল্য নেই। তাই নফলের আগে ফরজের হক আদায় করা আবশ্যিক।

মূলভিত্তি বা দলিল (الأصل/الدليل):

এই শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হলো বিখ্যাত হাদিসে কুদসি। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

অর্থ: “আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভের জন্য যা কিছু করে, তার মধ্যে আমি যা তার ওপর ফরজ করেছি, তা-ই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়।” (সহিহ বুখারি)

ব্যতিক্রম (الاستثناءات):

যদিও ফরজ উত্তম, তবে আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন যেখানে নফলের সওয়াব বা ফজিলেত ফরজের চেয়ে বেশি হতে পারে (যদিও সংখ্যায় কম)। যেমন:

১. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে সময় দেওয়া ওয়াজিব, কিন্তু ঋণ মার্ফ করে দেওয়া (নফল) বেশি সওয়াবের।

২. ওয়াক্ত হওয়ার আগে ওজু করা নফল, কিন্তু ওয়াক্ত হলে ওজু করা ফরজ। এখানে আগে ওজু করা (প্রস্তুতি) বেশি সওয়াবের।

উপসংহার (خاتمة):

ফরজ হলো আল্লাহর সরাসরি আদেশ পালন, আর নফল হলো অতিরিক্ত ভালোবাসা। আদেশের গুরুত্ব ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশের চেয়ে সবসময় অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন-৪১: ফরজের উপর নফলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রজ্ঞা কী, এবং আল্লাহ যা ওয়াজিব করেছেন তা মেনে চলার গুরুত্ব এর দ্বারা কীভাবে ব্যাখ্যা করা হয়?

(بين الحكمة من تفضيل الفرض على النفل، وكيف يفسر ذلك أهمية الالتزام بما أوجبه الله؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

আল্লাহ তাআলা কেন ফরজের মর্যাদা নফলের উপরে রাখলেন, তার পেছনে গভীর তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা (Hikmah) নিহিত রয়েছে।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রজ্ঞা (الحكمة من التفضيل):

১. আনুগত্যের পরীক্ষা: ফরজ হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ বা হুকুম। এটি পালন করা মানে রবের দাসত্ব স্বীকার করা। আর নফল হলো বান্দার নিজের ইচ্ছায় করা কাজ। নিজের ইচ্ছার চেয়ে প্রভুর আদেশের মূল্য অনেক বেশি।

২. শাস্তির ভয়: ফরজ ত্যাগ করলে শাস্তির ধমকি (Wa'id) আছে, কিন্তু নফল ত্যাগ করলে শাস্তি নেই। যা ত্যাগ করলে জাহান্নাম অবধারিত, তার গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

৩. কষ্টসাধ্যতা: ফরজ কাজগুলো নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট নিয়মে করতে হয়, যা নফলের চেয়ে অধিক কষ্টসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ।

ওয়াজিব মেনে চলার গুরুত্ব (أهمية الالتزام):

এই কায়দাটি ব্যাখ্যা করে যে, দ্বীনদারিতা মানে নিজের খুশিমতো ইবাদত করা নয়, বরং আল্লাহর চাওয়া অনুযায়ী ইবাদত করা।

- **উদাহরণ:** কোনো ব্যক্তি সারা রাত জেগে নফল নামাজ পড়ল (যা প্রশংসনীয়), কিন্তু সকালে ফজরের নামাজ (ফরজ) কাজা করল বা জামাত তরক করল। শরিয়তের দৃষ্টিতে সে ক্ষতিগ্রস্ত। কারণ, হাজার রাকাত নফল এক ওয়াক্ত ফরজের ঘাটতি পূরণ করতে পারে না।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ফরজের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি প্রমাণ করে যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি ‘পরিমাণে’ নয়, বরং ‘আনুগত্যে’ নিহিত।

প্রশ্ন-৪২: এ কায়দাটির প্রভাব একজন মুসলিমের আচরণ বিন্যস্ত করা এবং শরয়ী অগ্রাধিকারের প্রতি পরিচালিত করার ক্ষেত্রে কী, তা আলোচনা কর।

ناقش أثر هذه القاعدة في تنظيم سلوك المسلم وتوجيهه نحو الالتزام (بالأولويات الشرعية)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

‘ফরজ নফলের চেয়ে উত্তম’—এই কায়দাটি মুসলিম জীবনে ‘ফিকহুল আওলাবিয়্যাত’ (অগ্রাধিকারের ফিকহ) নির্ধারণে বাতিঘরের মতো কাজ করে। এটি মুসলিমদের দৈনন্দিন আচরণ ও সময় ব্যবস্থাপনাকে সুশৃঙ্খল করে।

আচরণ বিন্যস্তকরণে প্রভাব (أثر القاعدة):

১. ঋণ পরিশোধ বনাম দান:

অনেক মানুষ আছেন যারা মানুষের ঋণ (ফরজ) পরিশোধ না করে বড় অংকের দান-সদকা (নফল) করেন বা হজে যান।

- এই কায়দার শিক্ষা: আগে মানুষের পাওনা বা ঋণ শোধ করতে হবে, কারণ এটি ফরজ (হুকুকুল ইবাদ)। এরপর সামর্থ্য থাকলে নফল দান করবে। ঋণ রেখে দান করা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য অগ্রাধিকার নয়।

২. পর্দা বনাম নফল ইবাদত:

মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পর্দা লঙ্ঘন করে মাহফিল শুনতে যাওয়া বা নফল জিয়ারতে যাওয়া হচ্ছে।

- শিক্ষা: ফরজের ক্ষতি করে নফল অর্জনের চেষ্টা করা শয়তানের খোঁকা। আগে ফরজ পর্দা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. পিতা-মাতার সেবা বনাম নফল জিহাদ/সফর:

পিতা-মাতার সেবা করা বা তাদের হক আদায় করা ফরজ। তাদের কষ্ট দিয়ে নফল ইবাদতের জন্য সফরে বের হওয়া জায়েজ নেই।

অগ্রাধিকার নির্বাচন (تحديد الأولويات):

এই কায়দা মুসলিমদের শেখায় যে, জীবনের রুটিনে আগে ‘মাস্ট ডু’ (ফরজ/ওয়াজিব) কাজগুলো রাখতে হবে। এরপর সময় ও সুযোগ থাকলে ‘নাইস টু ডু’ (নফল/মুস্তাহাব) কাজগুলো করতে হবে।

উপসংহার (خاتمة):

পরিশেষে বলা যায়, এই কায়দাটি মুসলিম উম্মাহকে আবেগতাড়িত ইবাদত থেকে বের করে ভারসাম্যপূর্ণ ও শরিয়তসম্মত জীবনের দিকে পরিচালিত করে। ফরজের পিলারের ওপরই নফলের ছাদ নির্মাণ করতে হবে।

القاعدة الرابعة عشرة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
(চতুর্দশ কায়দা: ‘যা নেওয়া হারাম তা দেওয়াও হারাম’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৪৩: “মা হারুমা আখযুহু হারুমা ই‘তউহু” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং শরীয়তে এর মূলভিত্তি কী?

اشرح مدلول قاعدة : "ما حرم أخذه حرم إعطاؤه" وما هو مستندها الأصلي (في الشريعة (منع التعاون على الإثم))

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরিয়ত পাপের পথ রুদ্ধ করার জন্য ‘সাদদে জারাদ্দি’ বা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরই অংশ হিসেবে চতুর্দশ মূলনীতি ‘মা হারুমা আখযুহু হারুমা ই‘তউহু’ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাটিকে হারাম লেনদেন প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- মা হারুমা (ما حرم): যা কিছু নিষিদ্ধ বা হারাম হয়েছে।
- আখযুহু (أخذه): তা গ্রহণ করা বা নেওয়া।
- ই‘তউহু (إعطاؤه): তা প্রদান করা বা দেওয়া।

মর্মার্থ (المدلول):

যে বস্তু, অর্থ বা সুবিধা গ্রহণ করা কোনো ব্যক্তির জন্য হারাম, তা অন্য কাউকে প্রদান করাও হারাম। অর্থাৎ, গ্রহীতার জন্য নেওয়া নাজায়েজ হলে দাতার জন্য দেওয়াও নাজায়েজ। কারণ, হারাম কাজ সম্পন্ন হতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। 2

শরয়ী দলিল ও মূলভিত্তি (المستند الأصلي):

এই কায়দাটির মূল ভিত্তি হলো ‘পাপ কাজে সহযোগিতা না করা’।

১. কুরআন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

অর্থ: “তোমরা পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো না।”
(সূরা মায়িদা: ২)

যেহেতু হারাম বস্তু দেওয়া মানেই পাপীকে পাপে সাহায্য করা, তাই তা নিষিদ্ধ।

২. হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদ এবং ঘুষের ব্যাপারে বলেছেন:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ... وَالرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

অর্থ: “রাসুলুল্লাহ (সা.) সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী উভয়কে... এবং ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ প্রদানকারী উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।” (মুসলিম, তিরমিজি)

উপসংহার (خاتمة):

শরিয়ত কেবল পাপীকে শাস্তি দেয় না, বরং পাপের যোগানদাতাকেও সমান অপরাধী সাব্যস্ত করে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে চায়।

প্রশ্ন-৪৪: এ কায়দাটির সীমা সুস্পষ্ট কর; এটি কি এমন সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা হারাম কাজে ব্যবহৃত হয়, নাকি এমন সম্পদের ক্ষেত্রে যা নিজেই হারাম?

بين حدود هذه القاعدة؛ هل تنطبق على الأموال التي يستعمل فيها المحرم، (أم على المال الذي بذاته محرم؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সব হারাম লেনদেন এক প্রকৃতির নয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বস্তুর নিজস্ব সত্তা এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

কায়দার সীমা ও প্রয়োগক্ষেত্র (حدود القاعدة):

১. বিনিময় মূল্য হারাম হওয়া (عوض المحرم):

এই কায়দাটি মূলত এমন লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে বিনিময়টি (Counter value) কোনো হারাম কাজের বা বস্তুর বিনিময়ে দেওয়া হয়।

- **বিশ্লেষণ:** যেহেতু গান গাওয়া (অশ্লীল) বা জিনা করা হারাম, তাই এর বিনিময়ে টাকা নেওয়া হারাম। ফলে এই কাজের জন্য টাকা দেওয়াও হারাম। এখানে টাকা নিজে হারাম নয়, কিন্তু ‘বিনিময়’টি হারাম।

২. বস্তু নিজেই হারাম হওয়া (ছরমাতে আইন):

যদি বস্তুটি নিজেই হারাম হয় (যেমন: মদ, শুকর), তবে তা মুসলিমকে দেওয়া বা উপহার হিসেবে প্রদান করাও হারাম।

৩. ব্যবহারের উদ্দেশ্য:

যদি কোনো বৈধ বস্তু (যেমন: আঙ্গুর) কাউকে দেওয়া হয়, আর দাতা নিশ্চিত জানে যে গ্রহীতা তা দিয়ে মদ বানাতে (হারাম কাজ), তবে অধিকাংশ ফকিহদের মতে এই দেওয়াটাও মাকরুহে তাহরিমি বা হারামের পর্যায়ে পড়বে। তবে যদি সন্দেহ থাকে, তবে হারাম হবে না।

উপসংহার (خاتمة):

মূলত যে লেনদেনের ‘উদ্দেশ্য’ বা ‘বিনিময়’ শরিয়তে নিষিদ্ধ, সেখানেই এই কায়দা প্রযোজ্য। অর্থাৎ, পাপ কাজের মজুরি বা হারাম বস্তুর মূল্য—উভয় ক্ষেত্রেই দেওয়া ও নেওয়া সমান অপরাধ।

প্রশ্ন-৪৫: “মা হারুমা আখযুহু...” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর। যেমন: মদ বিক্রির মূল্য বা গায়িকার পারিশ্রমিক।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل: ثمن (الخمر أو أجرة المغنية)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সমাজ জীবনের বহু অনৈতিক লেনদেন এই কায়দার মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিচে তিনটি প্রসিদ্ধ ফিকহি উদাহরণ আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. ঘুষ বা রিশওয়াহ (الرشوة):

বিচারক বা কর্মকর্তার জন্য ঘুষ খাওয়া (নেওয়া) হারাম।

- **প্রয়োগ:** তাই বিচারককে ঘুষ দেওয়াও (ই‘তা) হারাম। কারণ দাতা না দিলে গ্রহীতা খেতে পারত না। এখানে উভয়ই সমান অপরাধী।^৫

২. গায়িকা বা বিলাপকারিণীর মজুরি (أجرة المغنية والناثحة):

অশ্লীল গান গাওয়া বা মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা (নোহারি) শরিয়তে নিষিদ্ধ (হারাম) কাজ।

- **প্রয়োগ:** তাই এই কাজের বিনিময়ে গায়িকা বা বিলাপকারিণীর জন্য টাকা নেওয়া যেমন হারাম, তেমনি শ্রোতা বা আয়োজকের জন্য তাদের টাকা দেওয়াও হারাম।

৩. হারাম বস্তুর মূল্য (ثمن الخمر والميتة):

মদ বা মৃত জন্তু খাওয়া বা বিক্রি করা হারাম।

- **প্রয়োগ:** তাই কারো কাছে মদ বিক্রি করে তার দাম নেওয়া হারাম। একইভাবে, জেনেশুনে বিক্রেতাকে মদের দাম দেওয়াও হারাম। কারণ হারাম বস্তুর কোনো বাণিজ্যিক মূল্য (Saman) শরিয়তে নেই।

উপসংহার (خاتمة):

উপরোক্ত প্রতিটি উদাহরণে দেখা যায়, গ্রহীতার পাপের কারণে দাতার হাতকেও শরিয়ত বেঁধে দিয়েছে।

প্রশ্ন-৪৬: এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন নিরুপায় হয়ে বা বৃহত্তর ক্ষতি দূর করার জন্য হারাম মাল দেওয়া বৈধ?

ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى يجوز دفع المال المحرم (اضطرارا أو لدفع ضرر أعظم؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

শরিয়তের সাধারণ নিয়ম হলো ‘হারাম দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ’। কিন্তু ইসলাম মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য চরম মুহূর্তে (Necessity) কিছু শিথিলতা বা ব্যতিক্রম (Istithna) অনুমোদন করে।

ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রসমূহ (الاستثناءات):

১. জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ (الرشوة لدفع الظلم):

যদি কোনো ব্যক্তি সরকারি অফিসে বা কোনো জালেমের কাছে নিজের ন্যায্য অধিকার (যেমন: আটকে থাকা বেতন বা পাসপোর্ট) আদায় করতে চায়, কিন্তু ঘুষ দেওয়া ছাড়া তা কোনোভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। অথবা নিজের জান-মাল বা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য টাকা দিতে বাধ্য হয়।

- **হুকুম:** এমতাবস্থায় যে দিচ্ছে (দাতা), তার জন্য টাকাটা দেওয়া বৈধ (গুনাহ হবে না)। কারণ সে নিরুপায় (Muztar) এবং নিজের হক আদায়ের জন্য দিচ্ছে।

- **শর্ত:** কিন্তু যে নিচ্ছে (গ্রহীতা), তার জন্য ওই টাকা নেওয়া **হারাম**-ই থাকবে।
এখানে কায়দাটি কেবল দাতার জন্য শিথিল করা হয়েছে, গ্রহীতার জন্য নয়।

২. বন্দি মুক্তি (فك الأسير):

কোনো মুসলিম বন্দিকে কাফের বা ডাকাতদের হাত থেকে ছাড়ানোর জন্য যদি মুক্তিপণ (টাকা) দিতে হয়।

- **হুকুম:** ডাকাতদের জন্য টাকা নেওয়া হারাম হলেও, বন্দির জীবন বাঁচাতে টাকা দেওয়া বৈধ।

৩. কবির অনৈতিক কবিতা বন্ধ করা:

কোনো কবি বা সমালোচক যদি টাকার বিনিময়ে কারো সম্মানহানি (কুৎসা রটনা) করা থেকে বিরত থাকে, তবে নিজের সম্মান বাঁচাতে তাকে টাকা দেওয়া বৈধ, যদিও তার জন্য তা নেওয়া হারাম (কারণ ব্ল্যাকমেইল করা হারাম)।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ‘যা নেওয়া হারাম তা দেওয়াও হারাম’—এই নিয়মটি স্বেচ্ছায় লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু ‘ইজতিরা’ বা বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মজলুম ব্যক্তি নিজের ক্ষতি এড়াতে হারাম মাল (টাকা) দিতে পারেন, এতে তার গুনাহ হবে না।

القاعدة الخامسة عشرة : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
(পঞ্চদশ কায়দা: ‘তাড়াহুড়োর শাস্তি’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৪৭: “মান ইস্তা‘জালাশ শাইয়া কবলাওয়ানিহি উকিবা বি-হিরমানিহি”
কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এর মূল দলিল কী?

اشرح مدلول قاعدة: "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" وما
(هو دليلها الأصلي؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি শরিয়তের একটি অত্যন্ত যৌক্তিক ও প্রতিরোধমূলক মূলনীতি হলো ‘মান ইস্তা‘জালাশ শাইয়া কবলাওয়ানিহি উকিবা বি-হিরমানিহি’। এই কায়দাটি অপরাধ ও লোভ সংবরণ করার জন্য একটি বড় হাতিয়ার। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এটিকে ফিকহী শাস্তির ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- ইস্তা‘জালা (استعجل): তাড়াহুড়ো করা বা সময়ের আগে চাওয়া।
- কবলাওয়ানিহি (قبل أوانه): তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে।
- উকিবা (عوقب): তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।
- বি-হিরমানিহি (بحرمانه): তা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে ^২।

মর্মার্থ (المدلول):

যে ব্যক্তি কোনো অধিকার বা সম্পদ পাওয়ার জন্য শরিয়ত নির্ধারিত সময়ের আগেই অবৈধ পন্থায় তাড়াহুড়ো করে, শরিয়ত তাকে শাস্তি হিসেবে ওই অধিকার বা সম্পদ থেকে চিরতরে বঞ্চিত করে দেয়। অর্থাৎ, অপরাধ করে তাড়াহুড়ো কিছু পেতে চাইলে ফলাফল হয় উল্টো—সে তা কখনোই পায় না।

মূল দলিল (الدليل الأصلي):

এই কায়দাটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস ও ইজমা থেকে গৃহীত। হাদিসে এসেছে:

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

অর্থ: “হত্যাকারী (নিহত ব্যক্তির সম্পদ থেকে) কিছুই উত্তরাধিকার পায় না।” (সুনানে আবু দাউদ)

যেহেতু হত্যাকারী তার আত্মীয়ের সম্পদ তাড়াতাড়ি পাওয়ার লোভে তাকে হত্যা করেছে, তাই শাস্তি হিসেবে তাকে মিরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়।

উপসংহার (خاتمة):

লোভী ব্যক্তিকে দমন করার জন্য এই কায়দাটি অত্যন্ত কার্যকর। এটি প্রমাণ করে যে, অন্যায় পথে লাভবান হওয়া যায় না, বরং প্রাপ্য অধিকারও হারাতে হয়।

প্রশ্ন-৪৮: উত্তরাধিকার (যেমন : উত্তরাধিকারীর তার ওয়ারিশকে হত্যা করা) এবং দানপত্রে এ কায়দাটি কীভাবে প্রযোজ্য, তা ব্যাখ্যা কর।

وضح كيف تطبق هذه القاعدة في باب الميراث (كقتل الوارث مورثه) (والميراث والوصية؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

উত্তরাধিকার (মিরাস) এবং ওসিয়ত (উইল) লাভের ক্ষেত্রে মানুষের লোভ কাজ করে। শরিয়ত এই লোভকে নিয়ন্ত্রণ করতে উক্ত কায়দা প্রয়োগ করে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ (في الميراث):

মিরাস পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো ‘মুনাসিখা’ বা মুরিস (যিনি মারা গেছেন) এর স্বাভাবিক মৃত্যু।

- **উদাহরণ:** যদি কোনো ছেলে তার ধনী বাবাকে দ্রুত সম্পত্তি পাওয়ার আশায় হত্যা করে।
- **হুকুম:** শরিয়ত ওই ছেলেকে বাবার সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত (Mahrum) করবে। যদিও সে শরিয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশ ছিল, কিন্তু সে ‘সময়ের আগে তাড়াহুড়ো’ করেছে হত্যা করার মাধ্যমে। তাই শাস্তি হিসেবে তার অধিকার বাতিল করা হলো।

ওসিয়ত বা দানপত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ (في الوصية):

ওসিয়ত বা উইল কার্যকর হয় ওসিয়তকারীর মৃত্যুর পর।

- **উদাহরণ:** যদি কোনো ব্যক্তি জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি তার নামে সম্পত্তির তিন-ভাগের এক ভাগ ওসিয়ত করেছে। এখন সে ওই সম্পত্তি দ্রুত পাওয়ার লোভে ওসিয়তকারীকে হত্যা করল।
- **হুকুম:** হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, এই হত্যাকারী ওসিয়তকৃত সম্পদ পাবে না। তার এই তাড়াহুড়োর কারণে ওসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে বঞ্চিত হবে 6666।

উপসংহার (خاتمة):

উভয় ক্ষেত্রেই মূল কারণ হলো—অপরাধমূলক তাড়াহুড়ো। শরিয়ত খুনিকে কখনো লাভবান হতে দেয় না।

প্রশ্ন-৪৯: “মান ইস্তা‘জালা...” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে তালাক দেওয়া বা হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করা।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: الطلاق (للإضرار أو الزواج بقصد التحليل)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

এই কায়দাটির প্রয়োগ শুধুমাত্র হত্যা বা মিরাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; পারিবারিক আইনের বিভিন্ন চক্রান্ত প্রতিরোধেও এটি ব্যবহৃত হয়। নিচে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ফিকহি শাখা (Furu) আলোচনা করা হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. তালাকুল ফার বা পলায়নমূলক তালাক (طلاق الفار):

কোনো স্বামী মৃত্যুশয্যায় (মারাযুল মাউত) থাকা অবস্থায় তার স্ত্রীকে এই উদ্দেশ্যে তালাক দিল যাতে স্ত্রী তার সম্পত্তির ওয়ারিশ না হতে পারে (কারণ স্ত্রী ওয়ারিশ হলে অন্য ওয়ারিশরা কম পাবে)।

- **হুকুম:** স্বামী এখানে স্ত্রীর উত্তরাধিকার বঞ্চিত করার জন্য ‘তাড়াছড়ো’ করেছে। তাই শরিয়ত স্বামীর উদ্দেশ্যকে উল্টে দেবে। ইন্দত পালনরত অবস্থায় স্বামী মারা গেলে ওই স্ত্রী তালাকপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মিরাস পাবে। স্বামীকে তার অসৎ উদ্দেশ্যের শাস্তি দেওয়া হলো।

২. হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ (نكاح المحلل):

তিন তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে আগের স্বামীর জন্য হালাল করতে কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিয়ে করে (যাতে দ্রুত তালাক দিয়ে তাকে হালাল করা যায়)।

- **হুকুম:** অনেক ফকিহের মতে, যদি শর্তযুক্তভাবে এমন বিয়ে করা হয়, তবে এই ‘তাড়াছড়ো’র কারণে বিয়েটিই মাকরুহ বা ফাসিদ হবে এবং এর দ্বারা প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হবে না (ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে শর্ত থাকলে হালাল হবে না)। কারণ এখানে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া লঙ্ঘন করে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে।

৩. শর্তযুক্ত দাসমুক্তি (تدبير العبد):

কোনো মনিব তার দাসকে বলল, “আমার মৃত্যুর পর তুমি স্বাধীন।” দাসটি দ্রুত স্বাধীন হওয়ার লোভে মনিবকে হত্যা বা জখম করল।

- **হুকুম:** এই দাস আর স্বাধীন হতে পারবে না। সে তার স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, কারণ সে সময়ের আগে স্বাধীনতা চেয়েছে^{৯৯}।

উপসংহার (خاتمة):

যেখানেই মানুষ শরিয়তের স্বাভাবিক গতিকে ধোঁকা দিয়ে পরিবর্তন করতে চায়, সেখানেই এই কায়দা প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন-৫০: লজ্জনের ফলে শাস্তি (আল-জাযা) বিষয়টি আলোচনা কর; এ বঞ্চনা পার্থিব শাস্তি নাকি ফিকহি বিধান?

ناقش مسألة الجزاء المترتب على المخالفة؛ هل يعد الحرمان عقوبة دنيوية (أم حكما فقهيًا)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

অপরাধীকে বঞ্চিত করা (হিরমান) কি আখেরাতের শাস্তির অংশ, নাকি এটি কেবল দুনিয়ার একটি আইনি ফয়সালা—এ নিয়ে ফিকহবিদদের মাঝে সূক্ষ্ম আলোচনা রয়েছে।

শাস্তির ধরন বিশ্লেষণ (تحليل الجزاء):

১. পার্থিব শাস্তি (عقوبة دنيوية):

অধিকাংশ উসুলবিদের মতে, এই বঞ্চনা বা হিরমান হলো একটি ‘উকুবাতুন দুনিয়াবিয়্যাহ’ (পার্থিব শাস্তি)। এর উদ্দেশ্য হলো—অপরাধীকে দমন করা (Zajr) এবং অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। রাষ্ট্র বা কাজি এই শাস্তি কার্যকর করেন যাতে কেউ লাভের আশায় অপরাধ না করে।

২. ফিকহি বিধান বা প্রতিবন্ধক (حكم وضعي):

উসুলুল ফিকহ-এর পরিভাষায় একে ‘মানি’ (প্রতিবন্ধক) বলা হয়। অর্থাৎ, হত্যার কারণে উত্তরাধিকার লাভের ‘কারণ’ (সবব) থাকার পরেও ‘মানি’ (বাধা) থাকার ফলে হুকুম (মালিকানা) সাব্যস্ত হয় না। এটি একটি আইনি (Legal) প্রক্রিয়া।

৩. আখেরাতের সম্পর্ক:

এই বঞ্চনা কেবল দুনিয়ার সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আখেরাতের শাস্তি (পাপের জন্য জাহান্নাম) আলাদা বিষয়। তবে দুনিয়াতে বঞ্চিত হওয়ার মাধ্যমে তার পাপের কিছুটা কাফফারা হতে পারে যদি সে তওবা করে।

উপসংহার (خاتمة):

এই বঞ্চনা মূলত একটি ফিকহি প্রতিবন্ধক যা পার্থিব শাস্তি হিসেবে কাজ করে। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামি আইন কেবল নৈতিকতার বুলি আওড়ায় না, বরং বাস্তবে অপরাধীকে নিষ্ফল করে দেয়।

القاعدة السادسة عشرة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
(ষোড়শ কায়দা: ‘বিশেষ ও সাধারণ কর্তৃত্ব’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৫১: “আল বিলায়াতুল খাসসাতু আকওয়া মিনাল বিলায়াতিল আম্মাহ”
কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং ব্যক্তি ও সমাজের ফিকহে এর মূল দলিল কী?

اشرح مدلول قاعدة : "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" وما هو
(دليلها الأصلي في فقه الأفراد والجماعات؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ইসলামি আইন ব্যবস্থায় অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের স্তরবিন্যাস অত্যন্ত সুসূক্ষ্ম। কার
অধিকার আগে—বাবার নাকি বিচারকের? এই প্রশ্নের সমাধানে ফিকহ শাস্ত্রের
ষোড়শ মূলনীতি ‘আল বিলায়াতুল খাসসাতু আকওয়া মিনাল বিলায়াতিল আম্মাহ’
প্রণীত হয়েছে। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই কায়দাকে পারিবারিক ও
সামাজিক ফিকহ-এর ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- আল-বিলায়াতুল খাসসাহ (الولاية الخاصة): বিশেষ কর্তৃত্ব। যেমন:
সন্তানের ওপর বাবার অভিভাবকত্ব, বা সম্পত্তির ওপর নিয়োগকৃত
মোতাওয়াল্লির অধিকার।
- আকওয়া (أقوى): অধিক শক্তিশালী বা প্রবল।
- আল-বিলায়াতুল আম্মাহ (الولاية العامة): সাধারণ কর্তৃত্ব। যেমন: দেশের
শাসক বা বিচারক (কাজি)-এর ক্ষমতা।

মর্মার্থ (المدلول):

যখন কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ব্যক্তির ওপর ‘বিশেষ অভিভাবক’ (যেমন: বাবা) এবং ‘সাধারণ অভিভাবক’ (যেমন: বিচারক) উভয়ের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের প্রশ্ন আসে, তখন বিশেষ অভিভাবকের ক্ষমতা সাধারণ অভিভাবকের চেয়ে প্রবল বা অগ্রগণ্য হবে। অর্থাৎ, বাবা বা মনোনীত অভিভাবক উপস্থিত থাকলে বিচারক বা শাসক সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

শরয়ী দলিল ও মূলভিত্তি (المستند الأصلي):

এর মূল ভিত্তি হলো শরিয়তের এই দর্শন যে, “নিকটাত্মীয় বা মনোনীত ব্যক্তি সাধারণত বাইরের শাসকের চেয়ে ওই নির্দিষ্ট ব্যক্তির কল্যাণের প্রতি বেশি যত্নশীল।”

• হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

অর্থ: “যার কোনো অভিভাবক নেই, শাসক তার অভিভাবক।” (তিরমিজি, আবু দাউদ)

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, বিশেষ অভিভাবক (বাবা/ভাই) না থাকলে তবেই শাসকের কর্তৃত্ব শুরু হয়। তার আগে নয়।

উপসংহার (خاتمة):

বিশেষ কর্তৃত্ব হলো মূল বা আসল, আর সাধারণ কর্তৃত্ব হলো তার বিকল্প বা সম্পূরক। আসল থাকলে বিকল্পের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-৫২: বিশেষ কর্তৃত্ব (যেমন: বাবার কর্তৃত্ব) এবং সাধারণ কর্তৃত্বের (যেমন: বিচারক বা শাসকের কর্তৃত্ব) মধ্যে উৎসগত দিক থেকে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।

بين الفرق بين الولاية الخاصة (كولاية الأب) والولاية العامة (كولاية القاضي) (أو الإمام) من حيث مصدر كل منهما

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ক্ষমতার উৎসের ভিন্নতার কারণেই ফিকহ শাস্ত্রে এই দুই ধরনের কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ কর্তৃত্ব বা ‘বিলায়াতুল খাসসাহ’ এবং সাধারণ কর্তৃত্ব বা ‘বিলায়াতুল আম্মাহ’-এর মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো।

পার্থক্য (الفرق):

বিষয়	বিশেষ কর্তৃত্ব (الولاية الخاصة)	সাধারণ কর্তৃত্ব (الولاية العامة)
উৎস (Source)	এর উৎস হলো রক্ত সম্পর্ক (নসব), আত্মীয়তা, বা ব্যক্তিগত চুক্তি (যেমন: কাউকে ওসিয়ত বা মোতাওয়াল্লি নিয়োগ করা)।	এর উৎস হলো শরিয়তের বিধান এবং রাষ্ট্রীয় নিয়োগ। এটি কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে আসে না, বরং পদের (Post) কারণে আসে।
পরিসর (Scope)	এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি (যেমন: নিজের সন্তান) বা নির্দিষ্ট বস্তুর (যেমন: ওয়াকফ সম্পত্তি) মধ্যে সীমাবদ্ধ।	এটি ব্যাপক এবং সার্বজনীন। দেশের সকল নাগরিক এবং সকল বিষয়ের ওপর এর এখতিয়ার রয়েছে।
শক্তি (Strength)	এটি সাধারণ কর্তৃত্বের চেয়ে শক্তিশালী। বিশেষ অভিভাবক উপস্থিত থাকলে সাধারণ অভিভাবক (বিচারক) হস্তক্ষেপ করতে পারে না।	এটি বিশেষ কর্তৃত্বের অনুপস্থিতিতে কার্যকর হয়। এটি মূলত শূন্যস্থান পূরণকারী (Residual)।
উদাহরণ	মেয়ের বিয়েতে বাবার অভিভাবকত্ব।	বাবা না থাকলে বিচারকের অভিভাবকত্ব।

বিশ্লেষণ:

বাবা তার সন্তানের প্রতি স্বভাবজাতভাবেই দয়ালু (শাফিক)। তাই শরিয়ত বাবার ক্ষমতাকে বিচারকের ক্ষমতার ওপরে স্থান দিয়েছে। বিচারকের ক্ষমতা কৃত্রিম ও আইনগত, আর বাবার ক্ষমতা প্রাকৃতিক ও সহজাত।

উপসংহার (خاتمة):

উৎসগত দিক থেকে বিশেষ কর্তৃত্ব ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব বলয় থেকে আসে, তাই এর অগ্রাধিকার সবস্বীকৃত।

প্রশ্ন-৫৩: বিশেষ কর্তৃত্বের উপর সীমাবদ্ধতা কী কী? কখন কর্তৃত্ব বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে স্থানান্তরিত হয়?

ناقش مسألة القيود على الولاية الخاصة؛ متى تنتقل الولاية من الخاصة إلى العامة؟

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও বিশেষ কর্তৃত্ব সাধারণ কর্তৃত্বের চেয়ে শক্তিশালী, কিন্তু এটি নিরঙ্কুশ বা অবাধ নয়। শরিয়ত বিশেষ অভিভাবকের ওপর কিছু শর্ত বা সীমাবদ্ধতা (Quyud) আরোপ করেছে। যখন বিশেষ অভিভাবক ব্যর্থ হয়, তখনই কেবল ক্ষমতা বিচারক বা সাধারণ অভিভাবকের হাতে চলে যায়।

বিশেষ কর্তৃত্বের সীমাবদ্ধতা (القيود):

১. স্বার্থ বিরোধী কাজ: বিশেষ অভিভাবক (যেমন: বাবা) যদি সন্তানের বা এতিমের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীতে কাজ করে (যেমন: এতিমের সম্পদ নিজের ভোগে লাগানো), তবে তার কর্তৃত্ব বাতিল হয়ে যায়।

২. অযোগ্যতা: অভিভাবক যদি পাগল হয়ে যায়, ধর্ম ত্যাগ করে (মুরতাদ হয়) বা ফাসিক (পাপী) হয় যার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা থাকে।

কর্তৃত্ব স্থানান্তরের ক্ষেত্রসমূহ (انتقال الولاية):

নিচের পরিস্থিতিগুলোতে ‘বিলায়াত’ বা অভিভাবকত্ব বিশেষ ব্যক্তি থেকে সাধারণ বিচারকের (Qadi) কাছে চলে যায়:

১. আদল বা বাধা দেওয়া (العضل):

যদি বাবা বা ভাই প্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে অন্যায়ভাবে বাধা দেয় বা দেরি করায়।

- **হুকুম:** এমতাবস্থায় বাবার ‘বিশেষ কর্তৃত্ব’ বাতিল হয়ে যাবে এবং বিচারক (সাধারণ অভিভাবক) মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করবেন।

২. অনুপস্থিতি (الغيبة المنقطعة):

বিশেষ অভিভাবক যদি নিখোঁজ থাকে বা এমন দূরে থাকে যে তার মতামত নিতে গেলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

- **হুকুম:** তখন বিচারক বা স্থানীয় শাসক অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. মৃত ব্যক্তির সম্পদ (Tarikah):

যদি মৃত ব্যক্তির কোনো উত্তরাধিকারী বা ওসি (Executor) না থাকে।

- **হুকুম:** তখন রাষ্ট্র বা বায়তুল মাল সেই সম্পদের জিদ্দাদার হবে।

উপসংহার (خاتمة):

বিশেষ কর্তৃত্ব ততক্ষণই শক্তিশালী, যতক্ষণ তা ন্যায়পরায়ণতার সাথে পালন করা হয়। জুলুম বা অবহেলা করলে সেই ক্ষমতা রাষ্ট্র বা বিচারকের হাতে ন্যস্ত হয়।

القاعدة السابعة عشرة : لا عبرة بالظن البين خطؤه

(সপ্তদশ কায়দা: ‘সুস্পষ্ট ভুলের ধারণা’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৫৪: “লা ইবরাতা বিজ জাম্মিল বাইয়্যিনি খাতাউহ্” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং প্রমাণ সংক্রান্ত ফিকহে এই কায়দাটির উদ্দেশ্য কী?

اشرح مدلول قاعدة : "لا عبرة بالظن البين خطؤه" وما هو الهدف من هذه (القاعدة في فقه الإثبات؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

বিচারকার্য ও ইবাদতের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ফিকহ শাস্ত্রের একটি সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক মূলনীতি হলো ‘লা ইবরাতা বিজ জাম্মিল বাইয়্যিনি খাতাউহ্’ 1। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.)-এর মতে, কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত যদি ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় এবং পরে সেই ভুলটি প্রকাশ পায়, তবে শরিয়তে ওই কাজের কোনো মূল্য নেই।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- লা ইবরাতা (لا عبرة): কোনো ধর্তব্য নেই, গ্রহণযোগ্যতা নেই বা মূল্য নেই।
- বিজ-জাম্মি (بالظن): এমন ধারণা বা অনুমানের, যা নিশ্চিত জ্ঞানের (ইয়াকিন) চেয়ে দুর্বল।
- আল-বাইয়্যিনি (البين): যা সুস্পষ্ট বা প্রকাশিত হয়েছে।
- খাতাউহ্ (خطؤه): তার ভুল বা ত্রুটি।

মর্মার্থ (المدلول):

মানুষ অনেক সময় প্রবল ধারণার (Zann) ওপর ভিত্তি করে আমল করে। কিন্তু পরবর্তীতে যদি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, ওই ধারণাটি ভুল ছিল, তবে সেই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে করা কাজ বা রায় বাতিল বলে গণ্য হবে 2। অর্থাৎ, ভুলের

ওপর সত্যের বিজয় হবে। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর আর ভুলের ওপর অটল থাকা যাবে না।

উদ্দেশ্য (الهدف):

প্রমাণ সংক্রান্ত ফিকহে (ফিকহুল ইসবাত) এই কায়দার উদ্দেশ্য হলো—ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। বিচারক যদি সাক্ষীর কথার ওপর ভিত্তি করে রায় দেন (যা একটি ধারণা), কিন্তু পরে প্রমাণিত হয় সাক্ষী মিথ্যা বলেছে (ভুল স্পষ্ট হওয়া), তবে আগের রায় বাতিল হয়ে যাবে। এটি ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো সিদ্ধান্তকে স্থায়ী হতে দেয় না।

উপসংহার (خاتمة):

সত্য যখন সামনে আসে, তখন অনুমান পেছনের দরজা দিয়ে পালায়। এটিই এই কায়দার শিক্ষা।

প্রশ্ন-৫৫: এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন যে মুফতির ইজতিহাদ সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تدرج تحت هذه القاعدة، مثل : (اجتهاد)
(المفتي الذي تبين خطؤه بالدليل القطعي)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

দৈনন্দিন জীবনে ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে মানুষ অনেক কাজ করে ফেলে। পরবর্তীতে ভুল ভাঙলে তার হুকুম কী হবে—তা এই কায়দার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। নিচে তিনটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ (Furu) দেওয়া হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. মুফতির ইজতিহাদ ও ভুল (اجتهاد المفتي):

প্রশ্নে উল্লিখিত উদাহরণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো মুফতি বা বিচারক যদি ইজতিহাদ করে কোনো ফতোয়া দেন, আর পরবর্তীতে কুরআন বা সুন্নাহর অকাট্য দলিলে (Nass) প্রমাণিত হয় যে তার ফতোয়াটি ভুল ছিল।

- **হুকুম:** এমতাবস্থায় তার আগের ফতোয়া বা রায় বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, তার ধারণাটি (Zann) সুস্পষ্টভাবে ভুল (Bayyin Khata) প্রমাণিত হয়েছে। অকাট্য দলিলের সামনে ধারণার কোনো মূল্য নেই।

২. জাকাত প্রদান (دفع الزكاة):

কোনো ব্যক্তি ধারণা করল যে, অমুক ব্যক্তি গরিব। তাই সে তাকে জাকাত দিল। পরে নিশ্চিতভাবে জানা গেল যে, ওই ব্যক্তি আসলে গরিব নয়, বরং ধনী (অথবা গ্রহীতা তার নিজের বাবা বা ছেলে, যাদের জাকাত দেওয়া যায় না)।

- **হুকুম:** অনেক ফকিহের মতে, এই জাকাত আদায় হবে না এবং পুনরায় দিতে হবে। কারণ, ‘গরিব হওয়ার ধারণা’টি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। (যদিও হানাফি মতে বিশেষ গবেষণার পর দিলে আদায় হয়ে যায়, তবে মূলনীতি হিসেবে ভুল প্রমাণিত হলে তা বাতিলযোগ্য)।

৩. কিবলা নির্ধারণে ভুল (الخطأ في القبلة):

কেউ অন্ধকারে ধারণা করে এক দিকে নামাজ পড়ল। নামাজের ভেতরেই বা পরে সে নিশ্চিত হলো যে, সে উল্টো দিকে নামাজ পড়েছে।

- **হুকুম:** যদি নামাজের ভেতরে ভুল ধরা পড়ে, তবে ওই ধারণার ওপর চলা যাবে না, সাথে সাথে ঘুরে যেতে হবে। কারণ আগের ধারণাটি এখন ‘সুস্পষ্ট ভুল’।

উপসংহার (خاتمة):

ভুল ধারণা যতক্ষণ গোপন থাকে ততক্ষণ তা আমলযোগ্য হতে পারে, কিন্তু যখনই তা ‘বাইয়িন’ বা স্পষ্ট হয়ে যায়, তখন তা ‘লা ইবরাহ’ বা বাতিল হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৫৬: প্রবল ধারণা (জান্ন গালিব)-এর বিষয়টি আলোচনা কর; কখন ধারণা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয় এবং এর দ্বারা বিধান অনুযায়ী কাজ করা হয়?

(ناقش مسألة الظن الغالب؛ متى يكون الظن حجة ويعمل به في الأحكام؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

পূর্বের প্রশ্নে বলা হয়েছে ভুল ধারণা বাতিল। কিন্তু শরিয়তের অনেক বিধান এমন আছে যা শতভাগ নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তাই শরিয়ত ‘জান্ন গালিব’ বা প্রবল ধারণাকে আমল করার অনুমতি দিয়েছে, যতক্ষণ না তা ভুল প্রমাণিত হয়।

জান্ন গালিব বা প্রবল ধারণা (الظن الغالب):

মানুষের মনের এমন অবস্থা যেখানে এক পক্ষের সম্ভাবনা অন্য পক্ষের চেয়ে অনেক বেশি ভারী হয়। শরিয়ত ব্যবহারিক জীবনে (Ahkam-e-Amaliyya) এই প্রবল ধারণাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে।

কখন ধারণা প্রমাণ হিসেবে গণ্য হয়? (متى يكون حجة):

১. ইবাদতের ক্ষেত্রে: যখন পানি পবিত্র কি না, কাপড় পাক কি না বা কিবলা কোন দিকে—এসব বিষয়ে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না, তখন মনের প্রবল ধারণার (Most likely) ওপর আমল করা ওয়াজিব।

২. বিচারকার্যে: বিচারক সাক্ষীদের মনের ভেতর দেখতে পারেন না। তিনি সাক্ষীদের সত্যতার ‘প্রবল ধারণা’র ওপর ভিত্তি করেই রায় দেন। এই ধারণা শরিয়তে হুজ্জাত বা প্রমাণ ৫।

ভুলের সাথে সম্পর্ক:

- **নিয়ম:** “ইয়াকিন (নিশ্চয়তা) অর্জন সম্ভব না হলে জান্ন গালিব-ই ইয়াকিনের স্থলাভিষিক্ত হয়।”
- **শর্ত:** এই প্রবল ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ না এর বিপরীতে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। যখনই নিশ্চিত প্রমাণ (যেমন: দলিল, স্বীকারোক্তি) পাওয়া যাবে, তখন আর এই ধারণার ওপর আমল করা যাবে না (যা প্রশ্ন-৫৪ এর মূল কায়দা)।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, ‘জান্ন গালিব’ বা প্রবল ধারণা শরিয়তে গ্রহণযোগ্য এবং এর দ্বারা বিধান দেওয়া হয়। কিন্তু যখনই এই ধারণাটি ভুল প্রমাণিত হয় (বাইয়িন খাতা), তখন তা বাতিল হয়ে যায়। অর্থাৎ, ধারণা সত্যের বিকল্প হতে পারে, কিন্তু সত্যের বিরোধী হতে পারে না।

القاعدة الثامنة عشرة : ذكر بعض ما لا يتجزأ ذكر كله

(অষ্টাদশ কায়দা: ‘অবিভাজ্য অংশ’ সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৫৭: “জিকরু বা‘দি মা লা ইয়াতাজায্যাউ কাজিকরি কুন্নিহি” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং উক্তির ফিকহে এর প্রমাণ কী?

اشرح مدلول قاعدة : "ذكر بعض ما لا يتجزأ ذكر كله" وما هي حجيتها (في فقه الأقوال؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

ফিকহ শাস্ত্রে মানুষের মুখের কথা বা স্বীকারোক্তির প্রভাব নির্ণয়ে এই কায়দাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে তালাক, দাসমুক্তি এবং কিসাসের মতো অবিভাজ্য বিষয়গুলোতে আংশিক শব্দ ব্যবহার করলে কী হুকুম হবে, তা এই কায়দার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) এই নীতিটিকে ভাষাতত্ত্ব ও শরিয়তের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

কায়দার শাব্দিক ও পারিভাষিক বিশ্লেষণ (التحليل):

- জিকরু (ذكر): উল্লেখ করা বা উচ্চারণ করা।
- বা‘দি (بعض): কিছু অংশ।
- মা লা ইয়াতাজায্যাউ (ما لا يتجزأ): যা বিভাজ্য নয় বা যা খণ্ডন করা যায় না।
- কাজিকরি কুন্নিহি (ذكر كله): তার পুরোটাই উল্লেখ করার মতো।

মর্মার্থ (المدلول):

যেসব বিষয় বা সত্তা প্রকৃতিগতভাবে বা শরিয়তের দৃষ্টিতে ভাগ করা যায় না, সেসব বিষয়ের কোনো অংশ বিশেষ (যা মূল সত্তাকে নির্দেশ করে) মুখে উচ্চারণ করলে

শরিয়ত ধরে নেয় যে, বক্তা পুরো বিষয়টিই বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ, অবিভাজ্য বস্তুর আংশিক উল্লেখ পূর্ণাঙ্গ উল্লেখের স্থলাভিষিক্ত হয়।

উক্তির ফিকহে এর প্রমাণ বা হুজ্জাত (الحجية):

এর যুক্তি বা প্রমাণ হলো ‘লুযুম’ (অপরিহার্যতা)।

১. যৌক্তিক প্রমাণ: অবিভাজ্য বস্তুর কোনো অংশের অস্তিত্ব থাকা মানেই পুরো বস্তুর অস্তিত্ব থাকা। যেমন—প্রাণের আংশিক অস্তিত্ব অসম্ভব; হয় প্রাণ আছে, না হয় নেই। তাই কেউ যদি প্রাণের বা জীবনের অবিচ্ছেদ্য কোনো অংশের কথা বলে, তবে সে মূলত পুরো জীবনের কথাই বলে।

২. শরয়ী প্রয়োগ: রাসুলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগেও দাসমুক্তির ক্ষেত্রে ‘ঘাড়’ (রাকাবা) বা ‘কপাল’ মুক্ত করার কথা বললে পুরো দাস স্বাধীন হয়ে যেত। অথচ ঘাড় বা কপাল মানুষের একটি অংশ মাত্র।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, অবিভাজ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে আংশিক শব্দ চয়ন করলেও পূর্ণাঙ্গ আইনি প্রভাব (Legal Effect) কার্যকর হবে।

প্রশ্ন-৫৮: এ কায়দায় ‘যা অবিভাজ্য’ বলতে কী উদ্দেশ্য এবং বিভাজ্য বস্তু থেকে এর পার্থক্য কী?

بين المراد من "ما لا يتجزأ" في هذه القاعدة، وما هو الفرق بينه وبين (الشيء الذي يقبل التجزئة؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সব বস্তুর ওপর এই কায়দা প্রয়োগ হয় না। তাই কোনটি ‘অবিভাজ্য’ (যা ভাগ করা যায় না) এবং কোনটি ‘বিভাজ্য’ (যা ভাগ করা যায়), তা নির্ণয় করা জরুরি।

‘মা লা ইয়াতাজায্যাউ’ বা অবিভাজ্য বস্তুর পরিচয় (المراد):

এখানে অবিভাজ্য বলতে এমন বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা ভাগ করলে তার মূল সত্তা বা হুকুম নষ্ট হয়ে যায় অথবা শরিয়ত যাকে অখণ্ড বলে ঘোষণা করেছে। এটি সাধারণত বিমূর্ত ধারণা (Abstract Concept) বা আইনি অবস্থার সাথে সম্পর্কিত।

- **উদাহরণ:** তালাক, বিবাহ বন্ধন, দাসত্বমুক্তি (ইতক), কিসাস (মৃত্যুদণ্ড), এবং মানুষের জীবন। এগুলোকে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশে ভাগ করা যায় না।

বিভাজ্য বস্তুর সাথে পার্থক্য (الفرق):

বিষয়	অবিভাজ্য বস্তু (ما لا يتجزأ)	বিভাজ্য বস্তু (ما يقبل التجزئة)
সংজ্ঞা	যা ভাগ করলে তার অস্তিত্ব বা মূল গুণ নষ্ট হয়।	যা ভাগ করলে তার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না, বরং পরিমাণে কমে।
আংশিক উল্লেখের হুকুম	এর অংশ উল্লেখ করলে পুরোটাই সাব্যস্ত হয়।	এর অংশ উল্লেখ করলে কেবল ততটুকুই সাব্যস্ত হয়।
উদাহরণ (তালাক vs বিক্রয়)	স্বামী বলল: “অর্ধেক তালাক”। হুকুম: পূর্ণ এক তালাক হবে।	বিক্রেতা বলল: “জমির অর্ধেক বিক্রি করলাম”। হুকুম: কেবল অর্ধেক জমিই বিক্রি হবে।
প্রকৃতি	এটি সাধারণত আইনি বিধান (Legal Status)।	এটি সাধারণত সম্পদ (Wealth/Goods)।

উপসংহার (خاتمة):

সহজ কথায়, বিধান বা হুকুম ভাগ করা যায় না, কিন্তু মাল বা সম্পদ ভাগ করা যায়।
এই কায়দাটি বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-৫৯: এ কায়দা থেকে ব্যতিক্রমের বিষয়টি আলোচনা কর এবং কখন অংশ উল্লেখ করা পুরোটা উল্লেখ করার মতো বলে গণ্য হয় না?

(ناقش مسألة الاستثناءات من هذه القاعدة، ومتى لا يعد ذكر البعض كذكر الكل)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

যদিও সাধারণ নিয়ম হলো অবিভাজ্য বস্তুর অংশ উল্লেখ করলে পুরোটা সাব্যস্ত হয়, কিন্তু হানাফী ফিকহে এর কিছু সূক্ষ্ম ব্যতিক্রম ও শর্ত রয়েছে। বিশেষ করে শরীরের কোন অঙ্গের নাম নেওয়া হলো, তার ওপর ভিত্তি করে হুকুম পাল্টে যেতে পারে।

ব্যতিক্রম ও সীমাবদ্ধতা (الاستثناءات):

১. অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গ নয় এমন অঙ্গের উল্লেখ (في الطلاق):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, তালাকের ক্ষেত্রে শরীরের এমন কোনো অঙ্গের নাম নেওয়া যার ওপর জীবন নির্ভরশীল নয় (যেমন: হাত, পা, আঙুল), তবে তালাক পতিত হবে না।

- **উদাহরণ:** স্বামী স্ত্রীকে বলল, “তোমার হাত তালাক” বা “তোমার পা তালাক”।
- **হুকুম:** হানাফী মতে, এখানে তালাক হবে না। কারণ হাত বা পা কেটে ফেললেও মানুষ জীবিত থাকে। তাই হাতের তালাক পুরো শরীরের (জীবনের) তালাক হিসেবে গণ্য হবে না। (যদিও ইমাম জুফার ও শাফেয়ী রহ. ভিন্নমত পোষণ করেন)।

২. অত্যাৱশ্যকীয় অঙ্গের উল্লেখ (বিপরীত চিত্র):

যদি এমন অঙ্গের নাম নেয় যা ছাড়া মানুষ বাঁচে না (যেমন: মাথা, ঘাড়, মুখমণ্ডল, রুহ বা কলিজা)।

- **উদাহরণ:** “তোমার গর্দান তালাক” বা “তোমার মাথা তালাক”।
- **হুকুম:** এক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে **তালাক হয়ে যাবে**। কারণ এই অঙ্গগুলো ‘পুরো জীবন’ বা ‘সত্তা’র প্রতিনিধিত্ব করে।

৩. একাধিক স্ত্রী বা দাসের ক্ষেত্রে:

যদি কারো দুইজন স্ত্রী থাকে এবং সে বলে, “তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজন তালাক”, কিন্তু নির্দিষ্ট না করে।

- **হুকুম:** এখানে তালাক অস্পষ্টতার কারণে আটকে থাকবে যতক্ষণ না সে ব্যাখ্যা দেয়। এটি সরাসরি ‘অংশ উল্লেখ করলে পুরোটা হওয়া’র কায়দায় পড়ে না, বরং এটি অস্পষ্টতার মাসআলা।

উপসংহার (خاتمة):

সুতরাং, হানাফী মাযহাবে ‘অংশ’ বলতে এমন অংশকে বোঝায় যা ‘শায়ি’ (Common) বা ‘অত্যাৱশ্যকীয়’ (Vital)। অপ্রয়োজনীয় বা বিচ্ছিন্নযোগ্য অংশের উল্লেখে পুরো হুকুম সাব্যস্ত হয় না—এটিই এই কায়দার প্রধান ব্যতিক্রম।

القاعدة التاسعة عشرة :

إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر

(উনবিংশ কায়দা: ‘আসনের পরিবর্তন’ বা ইজা তা’আজ্জারাল আসলু... সংক্রান্ত)

প্রশ্ন-৬০: “ইজা ইজতামাআল মুবাশিরু ওয়াল মুতাসাববিবু উদিফাল হুকমু ইলাল মুবাশির” কায়দাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র কোনটি?

اشرح مدلول قاعدة : "إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى (المباشر"، وما هو مجال تطبيقها الرئيسي؟

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের বিধানে দায়ভার (Liability) কার ওপর বর্তাবে—তা নির্ধারণে এই কায়দাটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়। যখন কোনো ঘটনার পেছনে একজন ‘সরাসরি সম্পাদনকারী’ এবং অন্যজন ‘প্রেক্ষাপট রচনাকারী’ থাকে, তখন শরিয়ত সাধারণত সরাসরি সম্পাদনকারীকেই দায়ী করে।

কায়দার শাব্দিক বিশ্লেষণ:

- আল-মুবাশির (المباشر): যে ব্যক্তি নিজ হাতে বা সরাসরি কাজটি সম্পাদন করে।
- আল-মুতাসাববিব (المتسبب): যে ব্যক্তি কাজের কারণ বা প্রেক্ষাপট তৈরি করে, কিন্তু সরাসরি কাজটিতে হাত দেয় না।
- উদিফাল হুকম (أضيف الحكم): বিধান বা দায়ভার ন্যস্ত করা হয়।

তাৎপর্য (المدلول):

যদি কোনো ক্ষতি বা অপরাধ সংগঠনের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে—একজন কাজের পরিবেশ তৈরি করেছে (পরোক্ষ কারণ), আর অন্যজন সেই পরিবেশ ব্যবহার করে সরাসরি ক্ষতি করেছে (প্রত্যক্ষ কারণ); তবে এমতাবস্থায় শরিয়তের বিধান,

শাস্তি বা ক্ষতিপূরণ কেবল ‘সরাসরি সম্পাদনকারীর’ (মুবাশির) ওপর বর্তাবে। কারণ, সরাসরি কাজটি মাঝখানের যোগসূত্র বা কারণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র (مجال التطبيق):

এর প্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হলো ‘দণ্ডবিধি’ (জিনায়াত/কিসাস) এবং ‘আর্থিক ক্ষতিপূরণ’ (দামান/ইতলাফ)। অর্থাৎ, হত্যা, জখম এবং সম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে কে দায়ী হবে, তা নির্ণয়ে এই কায়দা ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-৬১: ক্ষতিপূরণ ও শাস্তির ফিকহে সরাসরি কাজ (মুবাশির) এবং পরোক্ষ কারণ (মুতাসাববিব)-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট কর।

(بين الفرق بين الفعل المباشر والفعل المتسبب في فقه الضمانات والعقوبات)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

দায়ভার বা ‘দামান’ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য মুবাশির এবং মুতাসাববিব-এর সংজ্ঞায় ও বিধানে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

পার্থক্য (الفرق):

বিষয়	আল-মুবাশির সম্পাদনকারী) (সরাসরি	আল-মুতাসাববিব (পরোক্ষ কারণ)
সংজ্ঞা	যে ব্যক্তি কোনো মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি বস্তুর ক্ষতি করে। (যেমন: নিজের হাতে গ্লাস ভাঙা)।	যে এমন কোনো কাজ করে যা সাধারণত ক্ষতির কারণ হয়, কিন্তু ক্ষতিটি অন্য কোনো মাধ্যমে ঘটে। (যেমন: রাস্তায় গর্ত খোঁড়া, যাতে কেউ পড়ে যায়)।
শাস্তি/দায়ভার	তার কাজের জন্য সে দায়ী হবে, চাই সে ইচ্ছাকৃত	সে কেবল তখনই দায়ী হবে যদি তার কাজটি

	(Intentionally) করুক বা অনিচ্ছাকৃতভাবে। তার কাজ এবং ক্ষতির মাঝখানে কোনো ব্যবধান থাকে না।	‘সীমালজ্জন’ (Ta'addi) বা ইচ্ছাকৃত হয়। যদি সে বৈধভাবে কারণ তৈরি করে, তবে সে দায়ী নয়।
সম্পর্ক	ক্ষতির সাথে তার সম্পর্ক বাস্তব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (Hissi)।	ক্ষতির সাথে তার সম্পর্ক যৌক্তিক বা আইনি (Hukmi)।
উদাহরণ	যে ব্যক্তি ছুরি দিয়ে হত্যা করল।	যে ব্যক্তি হত্যার জন্য ছুরি এগিয়ে দিল বা দোকান থেকে কিনে আনল।

উপসংহার (خاتمة):

মুবাশিরের দায়ভার শক্তিশালী ও নিশ্চিত, আর মুতাসাববিবের দায়ভার শর্তসাপেক্ষ।

প্রশ্ন-৬২: কখন বিধান কেবল পরোক্ষ কারণের দিকে এককভাবে সম্বন্ধ করার
শর্তাবলি কী এবং কখন সরাসরি কার্য সম্পাদনকারীকে বাদ দেওয়া হয়?
(وضح شروط إضافة الحكم إلى المتسبب وحده، ومتى يترك المباشر؟)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

সাধারণ নিয়ম হলো মুবাশির বা সরাসরি সম্পাদনকারী দায়ী হবে। কিন্তু কিছু বিশেষ
পরিস্থিতিতে মুবাশিরকে বাদ দিয়ে মুতাসাববিব বা ‘কারণ রচনাকারীকে’ দায়ী করা
হয়। এটি এই কায়দার ব্যতিক্রম।

শর্তাবলি ও ক্ষেত্রসমূহ (الشروط والحالات):

যখন ‘সরাসরি কারণ’ (মুবাশির) দুর্বল হয় এবং ‘পরোক্ষ কারণ’ (মুতাসাববিব)
শক্তিশালী হয়, তখন বিধান মুতাসাববিবের দিকে ফেরানো হয়। এর ক্ষেত্রগুলো
হলো:

১. মুবাশির যদি প্রাণী হয়:

কেউ যদি কারো ফসলি জমিতে নিজের ছাগল ছেড়ে দেয় এবং ছাগল ফসল খেয়ে ফেলে।

- **হুকুম:** এখানে ছাগল হলো মুবাশির (সরাসরি খাদক), কিন্তু তার বিচার করা যায় না। তাই ছাগল ছেড়ে দেওয়া ব্যক্তি (মুতাসাববিব) দায়ী হবে।

২. প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার:

কেউ যদি কারো ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং বাতাস সেই আগুন ছড়িয়ে দিয়ে অন্য ঘর পুড়িয়ে দেয়।

- **হুকুম:** এখানে বাতাস (মুবাশির) দায়ী নয়, বরং আগুন লাগানো ব্যক্তি (মুতাসাববিব) দায়ী।

৩. প্রতারণা বা অজ্ঞতা (Ghurur):

যদি কেউ কোনো খাবার দিয়ে বলে "এটি আমার খাবার, তুমি খাও", অথচ খাবারটি বিষাক্ত বা অন্যের। অতিথি তা খেয়ে ফেলল।

- **হুকুম:** এখানে অতিথি (মুবাশির) দায়ী নয়, কারণ সে প্রতারিত হয়েছে। যে খাবার দিয়েছে (মুতাসাববিব), সে দায়ী হবে।

৪. জবরদস্তি (Ikrah):

কাউকে যদি হত্যার হুমকি দিয়ে অন্যের সম্পদ নষ্ট করতে বাধ্য করা হয়। অধিকাংশের মতে, জবরদস্তিকারী (মুতাসাববিব) দায়ী হবে।

উপসংহার (خاتمة):

সহজ কথায়, যখন সরাসরি সম্পাদনকারীর নিজস্ব কোনো 'ইচ্ছা' বা 'আইনি যোগ্যতা' থাকে না, তখনই কেবল পরোক্ষ কারণের দিকে বিধান বর্তায়।

প্রশ্ন-৬৩: “ইজা ইজতামাআল মুবাশির...” এ কায়দার অধীনে আসা ফিকহি শাখা-প্রশাখার মধ্যে তিনটি উল্লেখ কর, যেমন রাস্তায় কূপ খনন করা এবং অন্য কারো নিক্ষেপ করা।

اذكر ثلاثاً من الفروع الفقهية التي تندرج تحت هذه القاعدة، مثل: حفر البئر (في الطريق مع إلقاء الغير)

উত্তর:

ভূমিকা (مقدمة):

এই কায়দাটি প্রয়োগ করে ফকিহগণ বহু জটিল মামলার সমাধান দিয়েছেন। নিচে এর তিনটি প্রসিদ্ধ ফিকহি উদাহরণ (Furu) দেওয়া হলো।

ফিকহি শাখা-প্রশাখা (الفروع الفقهية):

১. কূপ খনন বনাম ধাক্কা দেওয়া (حفر البئر والدفع):

এক ব্যক্তি রাস্তায় অবৈধভাবে গর্ত বা কূপ খনন করল (সে মুতাসাববিব)। এরপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তি এসে তৃতীয় ব্যক্তিকে ধাক্কা দিয়ে ওই গর্তে ফেলে দিল এবং সে মারা গেল (দ্বিতীয় ব্যক্তি মুবাশির)।

- **হুকুম:** কিসাস বা দিয়াত (রক্তপণ) দ্বিতীয় ব্যক্তির (ধাক্কা দাতা) ওপর ওয়াজিব হবে। গর্ত খননকারী দায়ী হবে না। কারণ, ‘ধাক্কা দেওয়া’ কাজটি গর্ত খননের প্রভাবকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যদি কেউ ধাক্কা না দিতো এবং সে নিজে পড়ে যেতো, তবেই গর্ত খননকারী দায়ী হতো।

২. খাঁচা খোলা বনাম জবেহ করা (فتح القفص والذبح):

এক ব্যক্তি পাখির খাঁচা খুলে দিল (মুতাসাববিব)। পাখিটি উড়ে গেল না, বসে থাকল। এরপর অন্য এক ব্যক্তি এসে পাখিটি ধরে জবেহ করে ফেলল (মুবাশির)।

- **হুকুম:** জবেহকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। খাঁচা খোলার কারণে সে দায়ী হবে না, কারণ জবেহ করার মতো সরাসরি ধ্বংসাত্মক কাজ এখানে বিদ্যমান। (তবে পাখি উড়ে গেলে খাঁচা খোলা ব্যক্তি দায়ী হতো)।

৩. দোকান খোলা বনাম চুরি করা (فتح الدكان والسرقه):

এক ব্যক্তি রাতের বেলা অন্যের দোকানের তালা ভেঙে দরজা খুলে রাখল (মুতাসাববিব)। এরপর চোর এসে মালামাল চুরি করে নিয়ে গেল (মুবাশির)।

- **হুকুম:** চোরকে চুরির শাস্তি পেতে হবে এবং মাল ফেরত দিতে হবে। তালা ভাঙার জন্য প্রথম ব্যক্তি দায়ী হবে (তালার দাম দিবে), কিন্তু চুরির মালের জন্য সে দায়ী নয়। কারণ চোরের সরাসরি চুরি (Mubashara) তালা খোলার কারণকে গৌণ করে দিয়েছে।

উপসংহার (خاتمة):

এই উদাহরণগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষের ‘সরাসরি হস্তক্ষেপ’ বা স্বেচ্ছাকৃত কাজ পূর্ববর্তী সকল পরোক্ষ কারণকে বাতিল করে দেয় এবং দায়ভার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয়।